আল্লামা ইকবাল

pdf By Syed Mostafa Sakib

আলহাজ্ব শেখ আজিবুল হক

মল্লিক ব্রাদার্স

আল্লামা ইকবাল

আলহাজ্ব শেখ আজিবুল হক

pdf By Syed Mostafa Sakib

মল্লিক ব্রাদার্স
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৫৫, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

pdf By Syed Mostafa Sakib

Allama Iqbal
Written by
Alhaj Sekh Azibul Haque
Lalbazar, Bankura

প্রকাশক
আলহাজ আবদুর রহমান মল্লিক
মল্লিক ব্রাদার্স
৫৫, কলেজ স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০১৪

লেজার টাইপ সেটিং
অশোক, ৯৮৭৪০৩৭৫২১

মূল্য : ৪০ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

আলহাজ্ব মোল্লা আনোয়ারুল হক (ঢাকা)
আলহাজ্ব মোল্লা আনসারুল হক (ঢাকা)
ও
হাজীবিবি হাসিবা খাতুনকে (দিনাজপুর)
স্নেহের স্মৃতিস্বরূপ দিলাম।

—আলহাজ্ব শেখ আজিবুল হক

pdf By Syed Mostafa Sakib

ভূমিকা

শেকসপিয়র সম্পর্কে বলা হয় He is not for the age but for all times. একথা মহাকবি আল্লামা ইকবাল সম্পর্কেও বলা যেতে পারে। তিনি শুধু কবি ছিলেন না, ছিলেন দার্শনিকও। কবি গোলাম মোস্তফা এ সম্পর্কে খুব সুন্দর কথাই বলেছেন— 'ইকবাল শুধু কবি নন, দার্শনিকও। কাজেই তাঁকে বুঝতে হলে শুধু ভাববিলাসী হলেই চলবে না, দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীরও প্রয়োজন হবে। ইকবালের কাব্য-দর্শন সম্পর্কে কিছু বলতে গেলেও দর্শনমনা না হলে নতুন কিছুই বলা যাবে না। পাশ্চাত্য-দর্শনের মুকাবিলায় ইসলামী-দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা সহজসাধ্য নয়। সুখের বিষয় ইকবাল সেই কঠিন কাজই করে গেছেন। পাশ্চাত্য-দর্শনের গলদ কোথায় তা তিনি সার্থক ভাবেই দেখিয়ে গেছেন।'

কবি ইকবালের বিপ্লবী চিন্তাধারা মুসলিম জগতে এনেছে এক অভূতপূর্ব নবজাগরণ। যেমন বাংলায় এনেছেন কাজি নজরুল ইসলাম। উভয় কবিই অধঃপতিত নির্জিত হতাশাগ্রস্ত জাতিকে আত্মচৈতন্য ফিরিয়ে দিতে চেয়েছেন দুর্মর শক্তি-মন্ত্রে। শরাবন তহুরা ও আবেহায়াতের সুধা দিয়ে। বলা হয়ে থাকে— Nations are born in the hearts of poets. এই উভয় কবি তাই করেছেন। তাই উর্দুভাষী আলেম-উলামারা ইকবালের সঞ্জীবনী বাণী দিয়ে যেমন সবাইকে মুগ্ধ করেন, বাংলাভাষি আলেমগণও ওয়াজের মহফিলে নজরুলের নবী ভক্তির নজরানা পেশ করে শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিমোহিত করেন। কিন্তু উর্দুভাষীরা রাখেন না নজরুলের খবর, বাংলাভাষীরা অন্ধকারে ইকবাল সম্পর্কে। ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রথম ইকবালের কবিতার অনুবাদ করে বাঙালির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আর নজরুল ইসলাম ইকবাল-সাহিত্যের অনুবাদের জন্য বন্ধুদের কাছে অনুরোধ করেন এবং পথও কিছুটা প্রশস্ত হয়। কিন্তু ভারত-পাকিস্তান ভাগাভাগির পরে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হয়ে উঠলে উপমহাদেশের জনপ্রিয় 'সারে জাঁহাসে আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হামারা'র কবি আমাদের থেকে আরো দূরে সরে যান।

ফলে ইকবালের মতো মহৎ কবির আলোচনা এদেশে আর হয়নি বললেই চলে। যে কবি সম্পর্কে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"যে কবির কবিতার এমন বিশ্বজনীন মূল্য

pdf By Syed Mostafa Sakib

ছিল এত সহজে আমরা তাকে হারাতে দিতে পারি না।" যে কবি আপ্তবাক্যের মতো বলতে পারেন, 'মজহাব নহি শিখাতা আপস মে বৈর রাখনা' সেই কবি সম্পর্কে একটি পুস্তক লিখতে আমাকে অনুরোধ করলেন— ইসলাম-দরদী সুযোগ্য পিতার সুযোগ্য পুত্র জনাব আলহাজ্ব আবদুর রহমান মল্লিক সাহেব। এই জন্য আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি অনেক বাধা-বিপত্তিকে মাথায় নিয়ে। একাজে আমাকে সাহায্য করেছে আমার ছেলেমেয়েরাও। তাদের জন্য দোয়া। বইখানি সকলেরই ভালো লাগবে বলে আমার বিশ্বাস। এতে আমার কোনো কৃতিত্ব নেই। সব কৃতিত্ব আল্লাহ্‌রই! আল্লাহ্‌পাক প্রকাশককে অধিকতর নেক কাজ করার তওফিক দিন (আমিন)।

জানুয়ারি ২০১৪

শেখ আজিবুল হক
লালবাজার, বাঁকুড়া

সূ চি প ত্র

ইকবাল পরিচিতি	০৯
শিক্ষা ও কর্মজীবন	১৪
ইকবালের কবি-মানস	১৭
মুসলিম রেনেসাঁর কবি ইকবাল	২১
ইকবালের শিল্প-ভাবনা	২৪
কবি ইকবালের মূল্যায়ন	২৮
ইকবালের খুদী-দর্শন	৩১
ইকবাল জাতীয়তাবাদী ও আন্তর্জাতিকতাবাদী কবি	৩৫
আল্লামা ইকবাল ও ইসলামি দর্শন	৪০
ইকবাল ও রুমী	৪৫
ইকবাল ও তাঁর কয়েকটি কবিতা	৪৯
ইকবালের কয়েকটি বিখ্যাত কবিতা ও তার অনুবাদ	৫২
ইকবাল ও নজরুল	৬১
রুমী ইকবালের প্রিয় কেন	৭৩

pdf By Syed Mostafa Sakib

এই লেখকের অন্যান্য পুস্তক

১। আল কোরআনের আলোকে বিশ্বনবী আল-আরাবী
২। আওরঙ্গজেব : ধর্মনিরপেক্ষতা ও ইসলাম
৩। কাজি নজরুল ইসলাম ও বাংলা সাহিত্য (অপ্রকাশিত বাল্যরচনা সহ)
৪। কাজি নজরুল ইসলাম ও বাংলা সাহিত্য
(সংক্ষিপ্ত - ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)
৫। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলমানদের অবদান
৬। মহাত্মা হাজী মহম্মদ মহসীন
৭। আয়েশা স্মৃতি (সম্পাদনা)
৮। হাসনাহেনার ব্যথার গীতি (সম্পাদনা)
৯। এনায়েতুলের অশ্রু-স্মৃতি (সম্পাদনা)

ইকবাল পরিচিতি

ইকবাল উর্দু ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তিনি শুধু উর্দু নন ফারসি ভাষারও কবি। লিখেছেন ইংরেজি ও আরবিতেও। তিনি শুধু কবি নন দার্শনিকও। পেশায় অধ্যাপনা, লেখায় সাহিত্য রচনা যেমন করেছেন তেমনি কখনো করেছেন আইন-ব্যাবসাও। কিন্তু সব কিছুকে ছাড়িয়ে কবি হিসেবেই তাঁর সমাদর সর্বাধিক। অখণ্ড ভারতের কবি ইকবালের 'তারানায়ে হিন্দী' (ভারত-সঙ্গীত) 'সারে জাঁহাসে আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হামারা' একদা জাতীয় সংগীত রূপে সর্বত্র গাওয়া হতো। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মুখে মুখে ফিরত। এর সুমধুর সুর অপূর্ব ছন্দ ঝঙ্কার ও ঐতিহ্যিক চেতনা মানুষের মনকে আজও দোলা দেয়, আবিষ্ট করে।

কিন্তু কবির পক্ষে দুর্ভাগ্য, দেশভাগাভাগির ফলে এটি জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা পায়নি পাকিস্তানে, পায়নি ভারতেও। উপমহাদেশের উচ্চশিক্ষিত বহুভাষাবিদ কবি চষে বেড়িয়েছেন প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য দেশেও। ফলে বিশ্বের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিকাঠামোকে অত্যন্ত নিকট থেকে দেখার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। দেখেছিলেন তিনি ইসলামি ঐতিহ্যের উদার আলোকে সারা বিশ্বকে। ফলে উভয় দেশের সাংস্কৃতিক সত্যকে সখ্য-সূত্রে নিবন্ধনের কাজে তিনি দ্বৈত ভূমিকা যেমন পালন করেছেন তেমনি প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মানবতাহীন ভ্রষ্টাচারকে লেখনীর মাধ্যমে সম্মার্জনি দিয়ে দূরীভূত করতেও পিছপা হননি।

বস্তুত সাহিত্য-শিল্পের সংজ্ঞা কেমনতর হওয়া উচিত, সৃষ্টি-শ্রেষ্ঠ মানুষ কতখানি প্রাপ্যের হকদার, আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি মানুষের আসন কত সমুচ্চে একথা বলার সঙ্গে

pdf By Syed Mostafa Sakib

সঙ্গে যেখানে দেখেছেন মানবাত্মার লাঞ্ছনা, হীন অবমাননা, দেখেছেন নিপীড়ন-নির্যাতন, ধর্মের নামে ভণ্ডামি ও নৈতিক অধঃপতন সেখানে তাঁর লেখনি গর্জে উঠেছে তীক্ষ্ণধার খরতলোয়ার হয়ে। তিনি মানুষকে পথ দেখিয়েছেন চিরন্তন অথচ চির নূতন সত্যের উজ্জ্বল আলো ফেলে। ফলে তিনি হয়ে উঠেছেন যুগের নকীব তূর্যবাদক, বিপ্লবী কবি ও পথের দিশারি। তিনি মানুষকে অমৃতের অধিকার ভাগ করে নেবার তাগিদ দিয়েছেন। বলেছেন, আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ হবার জন্য। যা মানুষের মধ্যে রয়েছে প্রসুপ্ত অবস্থায়। এই আত্মদর্শন বা 'খুদী'র বোধ জাগ্রত না হলে খোদাকে পাওয়া যাবে না। লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় না। পূর্ণমানব বা ইনসানে কামেল (Perfect man) হওয়া যায় না। বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের আলোকে সুফিতাত্ত্বিক ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা ও মানবমুখীনতাই হচ্ছে তাঁর কাব্যের মূল সুর। যেমনটি দেখা গেছিল নজরুলের মধ্যে।

উর্দুভাষী ফারসিভাষী এই দার্শনিক কবিকে বাঙালি জানতে বা বুঝতে পারেনি। ভাষারূপী পর্দার আড়ালে এবং রাজনৈতিক প্রোপাগাণ্ডার ডামাডোলে তাঁর মূল্যায়ন আজও হয়নি। ওপার বাংলায় তাঁর সাহিত্য নিয়ে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ সর্বপ্রথম এদিকে বাঙালির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাঁর অনুবাদ কর্মের মধ্য দিয়ে। পরে কবি গোলাম মোস্তফা, মোহাম্মদ গোলাম রসুল, আব্দুল মজিদ, আশরাফ আলি প্রমুখ ওপার বাংলায় ইকবালের কাব্য-পরিচিতি তুলে ধরলেও এপার বাংলায় একমাত্র সত্য গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের "ইকবালের কবিতা" শীর্ষক পুস্তক ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। সত্য গঙ্গোপাধ্যায় নিজেই বলেছেন— 'এখন ভারতে ইকবালের কবিতার প্রথম বাংলা অনুবাদ করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দ বোধ করছি।'

এটাও ইকবালের পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য-পরিচিতি কিংবা মূল্যায়ন নয়। তবু তাঁর স্বতস্ফূর্ত উদ্যম ও উদ্যোগ প্রশংসনীয়।

ইকবালকে পাকিস্তানের স্বপ্ন-দ্রষ্টা ভেবে এই দেশে তাঁর সাহিত্য-দর্শন ও জীবনেতিহাস নিয়ে বিদ্বৎসমাজও এগিয়ে আসেননি। এটা খুবই পরিতাপের বিষয়।

এ সম্পর্কে কবি নজরুল প্রথম বাঙালিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। কবি আব্দুল কাদিরের লেখা থেকে জানা যায়, ১৯৩২ সালে কলকাতা ৩৯নং সীতানাথ রোডের বাসায় থাকাকালে কবি নজরুল একদিন আবদুল কাদির, আজিজুল হাকিম, আবদুল মজিদ সাহিত্যরত্ন প্রমুখের সম্মুখে ইকবালের আসরারে খুদী, যোকোয়া, হাফেজ ও ওমর খৈয়ামের সমগ্র রুবাইয়াত অনুবাদের সংকল্প করেন। তারই ফলশ্রুতিতে 'আসরারে খুদী' অনুদিত হয় আব্দুল মজিদ কর্তৃক এবং 'শেকোয়া'র অনুবাদ করেন আশরাফ আলি সাহেব এবং নজরুলকেই তা উৎসর্গ করেন। এইভাবে নজরুলই প্রথম ইকবাল-সাহিত্যকে বাংলার কাব্য-মালঞ্চে এনে মিলনের মালা গাঁথেন। এ প্রসঙ্গে

মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্ বলেন—

> "কাজি নজরুল ইসলাম ইকবালের কোনো রচনা অনুবাদ করেননি বটে, তবে প্রাচ্যের এই মহাকবির কাব্যের সাথে যে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল সে কথা মুহম্মদ সুলতান অনুদিত ইকবালের শেকোয়া ও জওয়াবে শেকোয়া কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা পাঠেই বোঝা যায়। তাতে নজরুল এই অনুবাদ মূলের সঙ্গে মিলিয়ে পড়েছেন বলে নিজেই উল্লেখ করেছেন।"
>
> (ইকবালের কবিতা : ফাররুক আহমদ ভূমিকা দ্রষ্টব্য)

আবার সমবয়স্ক না হলেও সমমনস্ক দুই দেশের দুই ভাষার দুই কবির মধ্যে চিন্তার সাযুজ্য ছিল অসাধারণ। অধ্যাপক গোলাম রসুল তাই তুলনা প্রসঙ্গে বলেছেন— উভয় কবিই ইসলামের দৃঢ়প্রীতি নিয়ে বুকে দুর্জয় সাহস এবং বলিষ্ঠ লেখনী ধারণ করে এগিয়ে এসেছিলেন নতুন কর্ম-প্রেরণায় জাতিকে জাগাতে। এই দুই কবির অবদান এদিক থেকে অবিস্মরণীয়। জাতি বহুকাল অবধি তাঁদের কাব্য থেকে চলার পথে অফুরন্ত প্রেরণা ও শক্তিলাভ করে ধন্য হবে।

'ইকবাল-প্রতিভা'র লেখক গোলাম রসুল ইকবাল-প্রতিভার যথার্থ মূল্যায়ন করেছেন বলেই আমরা মনে করি। তাঁর লিখিত প্রবন্ধগুলি সুচিন্তিত এবং সুনিশ্চিত। তাঁর গ্রন্থের 'পরিচয়-পত্র' প্রদান করেন কবি গোলাম মোস্তফা। প্রবন্ধগুলি তাঁরই সম্পাদিত 'মওবাহার' মাসিক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। গোলাম মোস্তফার প্রিয় কবি ইকবাল। ইকবালের যেমন প্রিয় কবি জালালুদ্দিন রুমী। আর রুমীর প্রিয় কবি ছিলেন শামস্ তবরেজ। এখানে গোলাম মোস্তফা ইকবাল-প্রতিভার পরিচিতি পেশ করেছেন এইভাবে—

'ইকবাল পরিচিতি'র লেখক প্রফেসর গোলাম রসুল সাহেবকে আগে থেকেই চিনি। তিনি বয়সে তরুণ, কিন্তু জ্ঞানে প্রবীণ। ইসলামের আদর্শ ও ভাবধারার সঙ্গে তিনি যতখানি পরিচিত হয়েছেন, তরুণ বাঙালি মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে সেরূপ খুব কমই দেখা যায়।

ইকবাল শুধু কবি নন, দার্শনিকও। কাজেই তাঁকে বুঝতে হলে শুধু ভাব-বিলাসী হলেই চলবে না, দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীরও প্রয়োজন হবে। ইকবালের কাব্যদর্শন সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলেও দর্শনমনা না হলে নতুন কিছুই বলা যাবে না। পাশ্চাত্য-দর্শনের মুকাবেলায় ইসলামী দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা সহজসাধ্য নয়। সুখের বিষয়, ইকবাল সেই কঠিন কাজই করে গেছেন। পাশ্চাত্য-দর্শনের গলদ কোথায়, তা তিনি সার্থকভাবেই দেখিয়ে গেছেন।

ইকবালের দৃষ্টি ও ধ্যান-ধারণা সহজে বাংলাভাষায় পরিচয় দেওয়া একই কারণে

pdf By Syed Mostafa Sakib

সহজ নয়। গোলাম রসুল সাহেব সে পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছেন দেখে খুশি হয়েছি। কুরআন শরীফের পরিপ্রেক্ষিতে এবং বর্তমান-দার্শনিক মতবাদের আলোকে তিনি ইকবাল-কাব্যের ও ইকবাল-চিন্তাধারার যে বিশ্লেষণ করেছেন তা খুবই উপভোগ্য হয়েছে। নানা দিক থেকে তিনি ইকবালকে দেখিয়েছেন। ইকবালকে চেনাবার জন্য বাংলাভাষায় এই ধরনের প্রচেষ্টা সম্ভবত এই-ই প্রথম। গভীর দরদ দিয়ে আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি ইকবাল-কাব্যের আলোচনা করেছেন। আলোচনা কোথাও শালীনতা হারায়নি। সর্বত্রই লেখকের তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির স্বাক্ষর আছে। যে ভাষা এবং যে ভঙ্গীতে দার্শনিক বিষয় আলোচিত হওয়া উচিত 'ইকবাল পরিচিতি'তে সেই ভাষা ও সেই দৃষ্টিভঙ্গীই আছে।

ইকবালের বিপ্লবী চিন্তাধারা মুসলিম জগতে এক অভূতপূর্ব নব-জাগরণ। মুসলিমের 'খুদী'তে লেগেছে আগুনের ছোঁয়া। প্রদীপ্ত চেতনায় যে জেগে উঠেছে। মুসলিম মনে আজ যে নতুন জীবন-চাঞ্চল্য দেখা যায়, তার মূলেও আছে ইকবালের জ্যোতির্ময়ী বাণী।

বস্তুত ইসলামের কাব্যরূপ যে কত সুন্দর, বলিষ্ঠ ও দুর্বার হতে পারে এ যুগে ইকবাল তা জগতকে দেখিয়েছেন।

কবি গোলাম মোস্তফা এরপর দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন—

> নিতান্ত দুঃখের বিষয়, বাংলার মুসলমান ইকবাল-কাব্যের সহিত এখনও সম্যক পরিচিত হয়ে উঠেনি। ইকবালের বিশ্ব ও জীবন-বোধের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যে মুসলমানদের কত প্রয়োজন, তা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই বুঝবেন। সুখের বিষয়, এই প্রয়োজনের দিনে অধ্যাপক গোলাম রসুল 'ইকবাল পরিচিতি' (ইকবালের প্রতিভা) নিয়ে কওমের দুয়ারে হাজির হয়েছেন। এইজন্য তাঁকে দিই আমার অকুণ্ঠ মুবারকবাদ। আমাদের তামাদ্দুনিক সংগঠনের পক্ষে এই বইখানি যে খুবই মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে, সে কথা বলাই বাহুল্য।
>
> 'ইকবাল পরিচিতি'র অনেকগুলি প্রবন্ধই 'নওবাহারে' প্রকাশিত হয়েছিল।
>
> গত পাঁচ বছরে যা-কিছু মনন-সাহিত্য রচিত হয়েছে, তার মধ্যে 'ইকবাল-পরিচিতি' যে অগ্রগণ্য তাতে আমার সন্দেহ নেই।
>
> প্রত্যেক শিক্ষিত মুসলমানের ঘরে ঘরে এই বইখানি বিরাজ করুক, এই আমার কামনা।
>
> —গোলাম মোস্তফা

মোওকা-মঞ্জিল,
শান্তিনগর, ঢাকা,
৪/৪/৫৩

ইকবালকে বুঝতে হলে শুধু কবি ইকবালকে নয়, দার্শনিক ইকবালকেও জানতে হবে। দার্শনিক ইকবালকে জানতে হলে ইসলামী-দর্শন তথা কোরআন ও হাদিস সম্পর্কেও অবহিত হতে হবে। বুঝতে হবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ও যুক্তির কষ্টি-পাথর তথা ইজতেহাদের মানদণ্ডে। খুবই দুঃখের ব্যাপার ভাষার অবগুণ্ঠনে ঢাকা আরবি-ফারসি-উর্দুর বিখ্যাত কবিদের আমরা খোঁজ রাখি না। আর উর্দুভাষীরাও খোঁজ রাখেন না বাঙলার শ্রেষ্ঠ কবিদের সম্পর্কে। হিন্দির সেরা কবিদের নিয়ে আলোচনা হয়। বিদেশি কবিদের সাহিত্যের পরিচয়ও পাওয়া যায়। কবিতা গল্প ভাষান্তরিত হয়। রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের অনুবাদ ভারতের প্রায় সব ভাষাতেই হয়েছে। হয়েছে দেশ-বিদেশের বহু ভাষাতে। ফারসি-কবি হাফেজ, ওমর খৈয়াম, রুমী, জামীকে নিয়েও দেশে-বিদেশে কাজ হয়েছে অনেক। হয়েছে গালিব, বাহাদুরশাহ, আমীর খসরুকে নিয়েও। কিন্তু ইকবাল এবং নজরুল সম্পর্কে সরকারি এবং বেসরকারিভাবেও কাজ তেমন হয়নি বললেই হয়। এটা আমাদের জাতীয় লজ্জার কথা। ইকবাল এবং নজরুল শুধু সাহিত্য-মহলে নয়, আলেম সমাজের কাছেও গ্রহণযোগ্য। ইসলামি সত্তার জাগরণে তাঁরা ভোরের মুয়াজ্জিনের কাজ করেছেন বলতেই হবে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

শিক্ষা ও কর্মজীবন

মুহাম্মদ ইকবাল ১৮৭৩ ইসায়ী সনের ২২ ফেব্রুয়ারি বর্তমান পাকিস্তানের পাঞ্জাবের অন্তর্গত শিয়ালকোট শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষরা ছিলেন সাপ্রু বংশীয় কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ। প্রায় আড়াইশ বছর আগে ইকবালের পূর্ব-পুরুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ইকবালের পিতা নুর মুহাম্মদ একজন ধর্মনিষ্ঠ সুফী মানুষ ছিলেন। তাঁর মায়ের নাম ছিল ইমাম বিবি। তাঁদের দুই পুত্র আতা মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইকবাল। আতা মুহাম্মদ ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার। আর ইকবাল হন অধ্যাপক-কবি-দার্শনিক-ব্যারিস্টার ও রাজনৈতিক প্রবক্তা। আতা মুহাম্মদ মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হলেও কনিষ্ঠ ইকবাল ভর্তি হন মিশন স্কুলে। এখানে খ্যাতনামা মাওলানা শামসুল উলামা মীর হাসানের নিকট তিনি শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। পরে শিয়ালকোট থেকে লাহোরের সরকারি কলেজে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। এবং ১৮৯৯ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে দর্শনশাস্ত্রে এম. এ. (১ম শ্রেণিতে ১ম) ডিগ্রি লাভ করেন। অতঃপর তিনি লাহোরের ওরিয়েন্টাল কলেজে ও পরে সরকারি কলেজে প্রায় ছয় বছর অধ্যাপনা করেন।

এই সময় পাশ্চাত্যের পন্ডিত টমাস আরনল্ডের সঙ্গে ইকবাল পরিচিত হন। আরনল্ডের উৎসাহেই তিনি ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে উচ্চশিক্ষার জন্য ইংলন্ড যাত্রা করেন। এবং তিন বৎসর ধরে জ্ঞান-সাধনা করে প্রতীচ্যের শিক্ষা ও সভ্যতা সম্পর্কে সম্যক অবহিত হবার সুযোগ পান। যা তাঁর সাহিত্য-মননকে ঋদ্ধ করেছিল। তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পন্ডিত ম্যাকটে গার্ট ও জেমস ওয়ার্ডের নিকট পাশ্চাত্য দর্শন অধ্যয়ন করেন এবং ইরানি মিস্টিসিজম (mysticism) সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করে জার্মানির মিউনিখ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। তারপর লন্ডনে ব্যারিস্টারি পাশ করে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি ভাষার অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। ১৯০৮ সালে ডক্টর ইকবাল স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং লাহোরে সবকারি কলেজে ইংরেজি

সাহিত্য ও দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তারপর পাঞ্জাব হাইকোর্টে আইন ব্যাবসা শুরু করেন। তিন বছর পর তিনি স্বাধীনভাবে সাহিত্য চর্চার জন্য সরকারি চাকরি থেকে ইস্তফা দেন। এবার পুরোপুরিভাবে সাহিত্যকর্মে মনোনিবেশ করেন।

উর্দুতে প্রসিদ্ধ কবি হিসেবে দাগ তখন যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। ইকবাল তাঁর সান্নিধ্যে এসে সাহিত্যে তাঁর হাতকে পোক্ত করে নেন। এক উর্দু মুসায়েরায় তৎকালীন উর্দুর শ্রেষ্ঠ কবি মির্জা ইরশাদ গুর্গানির সভায় ইকবাল একটি দ্বিপদী কবিতা পাঠ করেন। তা হল —

মোতি সমঝকে চুন লিয়ে শানে করিমীনে
কতরে জো থে মেরে ইর্কে আল্‌ফ আলকে।

অর্থাৎ

অনুশোচনায় বাহিরিল মোর স্বেদের বিন্দুচয়
মোতি মানি তায় সব ক'টি তার তুলে নিল দয়াময়।

এই দ্বিপংক্তির কবিতা শুনে মির্জা গুর্গানি অভিভূত হয়ে বলেন—

'শুভানাল্লাহ্! এই বয়সে এমন শ'য়ের!'

১৯০১ সালে উর্দু মাসিকপত্র স্যার আব্দুল কাদির সম্পাদিত ১ম সংখ্যা 'মখজনে' তাঁর বিখ্যাত 'হিমালয়' কবিতাটি প্রকাশিত হয়।

এই পত্রিকায় লেখালেখি থেকেই সর্বভারতীয় খ্যাতি ও প্রতিপত্তি তিনি অর্জন করেন।

ইকবাল উর্দু ও ফারসি উভয় ভাষাতেই কবিতা লিখেছেন। প্রথমে ফারসি ভাষাতেই তিনি লিখতেন। যার কাব্য সংখ্যা ছয় এবং উর্দুর কাব্য সংখ্যা চার। উর্দু পুস্তকগুলি হল— ১) বাঙ্গেদরা (ভোরের আওয়াজ, ১৯২৪), ২) বালে জিব্রিল (জিব্রিলের ডানা, ১৯৩৫), ৩) জর্রেকলীম (কলীমের শাসন, ১৯৩৬), ৪) আর্মাগানে হেজাজ (হেজাজের উপহার, ১৯৩০)। গজলে বালে জিব্রিল তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ।

ফারসি কাব্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— আসরারে খুদী (খুদী রহস্য, ১৯১৪) এবং রমুজে বেখুদী (বেখুদী রহস্য, ১৯১৫)। জাভেদনামা তাঁর অপর একটি বিখ্যাত ফারসি গ্রন্থ।

১৯২৩ সালে পায়াম-ই-মাশরিক, ১৯২৭ সালে জবুর-ই-আজম প্রকাশ করেন। ১৯২১ সাল থেকে ১৯৩৬ সালের মধ্যেই প্রকাশিত হয়— খিজ্‌রে রাহ্, তুলুয়ে ইসলামী প্রভৃতি। তাঁর উল্লেখযোগ্য সুচিন্তিত কালজয়ী গ্রন্থ হল Reconstruction of Reli-

pdf By Syed Mostafa Sakib

gious thought in Islam.

এছাড়া শেকোয়া এবং জওয়াবে শেকোয়া হচ্ছে সুপ্রসিদ্ধ তত্ত্বমূলক কাব্যগ্রন্থ।

কালের প্রয়োজনে কবিরা সাড়া দেন। দেশ-কাল-সমাজের প্রতি চোখ-কান খোলা না রেখে আত্ম-উদাসীন কাব্য-বিলাসী হতে পারেন না। জাতীয় জাগরণে, সামাজিক আন্দোলনে, মানব কল্যাণে তাঁদের ভূমিকা অগ্রগণ্য চারণের। যুগ-নকীবের। যুগ-ইমামের। নজরুলের ন্যায় তিনিও তাই রাজনীতির মাধ্যমে অংশগ্রহণ করে স্বয়ং কাণ্ডারীর ভূমিকা পালন করতে এগিয়ে এসেছিলেন।

১৯২৭ সালে কবি পাঞ্জাব আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৩০ সালে মুসলিম লিগের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতি মনোনীত হন।

১৯৩১ সালে ইকবাল বিলাতের গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করেন।

১৯৩২ সালে পুনরায় মুসলিম লিগের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।

শেষের দিকে তিনি দর্শনে অধ্যাপনার জন্য লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক পান। কিন্তু স্বাস্থ্যের অবনতির জন্য তিনি তা পারেননি।

১৯৩৮ সালের ২১ এপ্রিল এই মহাকবির জীবনাবসান হয়।

ইকবালের কবি-মানস

মহাকবি ইকবাল উদার মানসিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন। ইসলামী ঐতিহ্যে লালিত হওয়ায় তিনি যেমন ইসলামের গৌরবময় ইতিহাসের সৌরভ বুকে ধারণ করেছিলেন তেমনি আধুনিক বিশ্বের গতি-প্রকৃতি ও প্রগতি সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়ার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন পাশ্চাত্য থেকে। ফলে বর্তমান মুসলিমদের জ্ঞানহারা ঐতিহ্যহারা সর্বহারা রূপ দেখে তিনি বিশ্ব-মুসলিম সমাজকে ঐতিহ্য-সচেতন করার জন্য ভোরের মুয়াজ্জিনের, যুগের নকীবের, পথ-প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছিলেন।

তিনি বিশ্বাস করতেন ধর্ম মানুষের মর্মমূলে গাঁথা। ধর্মই জাতির উত্তরাধিকার। কাজেই জীবন থেকে যেমন ধর্ম বাদ দেওয়া যায় না, তেমনি ধর্ম ছাড়া সাহিত্যও নিরর্থক। তাঁর মতে সাহিত্য থেকে ধর্মকে বাদ দিলে থাকে চেঙ্গিজী। বিজ্ঞানী আইনস্টাইন যেমন বিশ্বাস করতেন Religion without science is lame and Science without religion is blind। এই বিশ্বাস পোষণ করতেন মনীষী ইকবালও।

তিনি বিশ্বাস করতেন জাতিকে জাগাতে হলে চাই আত্মশক্তির উদ্বোধন। নিজের শক্তি সম্পর্কে অবহিত হওয়া। মানুষ যে আল্লাহ্‌র খলিফা, সে অমৃত-শক্তির অধিকারী। সেই শক্তির সাধনা না করলে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য পূরণ করা সম্ভব নয়। মানব-ধর্ম সাধিত হয় না। তাই তিনি তাঁর ক্ষুরধার লেখনীকে অশনি করে তুলেছিলেন। নিদ্রিত জাতিকে, আসহাব-কাহাফের মতো নিদ্রাতুর সমাজকে জাগাবার জন্য নজরুলের মতো তিনিও জাগরণী দাওয়াই ও দাওয়া পেশ করেছিলেন জাতির সামনে। যার রসদ সংগ্রহ করেছিলেন তিনি আলকোরআন ও আলহাদিসের যারাবন তহুরা থেকে, আবেহায়াত আবে কওসরের নহর থেকে।

তাই তিনি বলেছেন— ধর্ম শুধু পরলোকের জন্য নয় সে ইহলোকের মুক্তিদাতা। আমাদের জীবনের চিন্তায় কর্মে অনুভূতিতে তার ভূমিকা অনস্বীকার্য, অপরিহার্য।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ধর্মীয় অনুভূতি মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সফলতাকে নিবিড় বন্ধনে আবিষ্ট করে। স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি যে মানব সৃষ্টিকর্তার অনুগ্রহে লালিত-পালিত-বর্ধিত-উন্নীত সে বোধটুকু জাগিয়ে তোলাই ধর্মের কাজ। এ সম্পর্কে কোরআনের ভূমিকা প্রসঙ্গে তাঁর সদর্থক উক্তি — The main purpose of the Quran is to awaken in man the higher consciousness of his manifold relations with God and the Universe.' তাঁর মতে কাব্য-কবিতা তাই বিলাসের বস্তু নয়— প্রয়োজনের সামগ্রী। জীবনের অঙ্গ। মানুষ অলস জড় বস্তু নয়। দুর্বল নয়, অমিত শক্তির অধিকারী। তাই তাকে উদ্দেশ্য সাধনে বীর সৈনিকের ভূমিকা পালন করতে হবে। জীবন-বিমুখতা মানবের ধর্ম নয়। তাঁর মতে—বাস্তবের বিরোধিতা করে যারা মানুষকে জীবন-সংগ্রাম থেকে বিমুখ করে, জীবন থেকে মৃত্যুকে শ্রেয় মনে করে সেইসব সুফি, দার্শনিক ও নৈরাশ্যবাদী কবিকে তিনি সমর্থন করেন না।

কিন্তু ধর্মের সঙ্গে কর্মকে সামিল করে পরার্থে জীবন যাপনই কবির ইপ্সিত জীবন। মানব প্রেমই যার আসল মূলধন। কবি তাঁদের সমর্থন করে বলেন—

ভালবাসার সাধ যদি থাকে তো ফকীদের সেবা কর
প্রেমের মতো অমূল্য-মণি বাদশাদের ধনাগারে পাবে না।

ইকবালের কাব্যে বুদ্ধি অপেক্ষা প্রেম বড়। দর্শনের যুক্তির কচকচি অপেক্ষা হৃদয়ের স্বচ্ছ দর্পণের সাহায্যেই ঈশ্বর-দর্শন করা সহজ। দৃষ্টি ধোকা দেয় কিন্তু সুফীদের স্বচ্ছ হৃদয়ের কাশ্‌ফ অভ্রান্ত। তাই বলেন—

রহস্য-দেখা চোখ খোদার কাছে চাও
চোখের আলো ও হৃদয়ের আলো এক নয়।

রহস্যের মর্ম-সন্ধানী হাফিজের মতো রুমীর মতো ইকবালও মিস্টিসিজ্‌ম-এ বিশ্বাসী। তাই জাগতিক জ্ঞান অপেক্ষা পারমার্থিক সূক্ষ্ম শক্তিরই তিনি পক্ষপাতী। তাই সুফী তাত্ত্বিক কবিদের ন্যায় তিনিও বলেন—

বিদ্যায় আনন্দ আছে ঠিকই, কিন্তু সে
হুরহীন জান্নাতের মতো শক্তিহীন।

ইকবালের মতে ইন্দ্রিয় যার নাগাল পায় না, হৃদয় পারে তারই সঙ্গে আপোস করতে। আল্লাহ্ প্রদত্ত যে বিপুল শক্তি মানুষ পেয়েছে তার সদ্ব্যবহারেই মানবাত্মা পুষ্টিলাভ করে। তার আত্মার জাগরণ ঘটে। পূর্ণতা পায়। ধর্ম তাই তাঁর মতে তথাকথিত কোনো মতবাদ (dogma) কোনো পৌরোহিত্য বা মোল্লাগিরি (priesthood) নয়,

কোনো প্রথাসর্বস্ব (ritual) অনুষ্ঠান নয় বরং ইসলামের দৃষ্টিতে ধর্ম হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ জীবন-বিধান। তাঁর মতে Religion is not a departmental affair, it is neither mere thought, nor mere feeling, nor mere action, it is an expression of the whole man.

ইকবালের দৃষ্টিভঙ্গীতে মানুষ যেমন হবে স্রষ্টার প্রতি আনুগত্যশীল তেমনি প্রগতিবাদী এবং যুক্তিবাদীও। সমাজের প্রতি দেশের প্রতি জাতির প্রতি দায়বদ্ধতা তিনি কখনো অস্বীকার করেননি। ধর্ম এবং কর্মের, জীব ও জগতের, সৃষ্টি এবং স্রষ্টার মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধনই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তিনি যেমন বস্তুবাদী, জড়বাদী নিরীশ্বরবাদী দার্শনিক ছিলেন না তেমনি জীবনবিমুখ অধ্যাত্মবাদী কবিও তিনি ছিলেন না।

প্রাচ্যের রক্ষণশীলতা, কূপমণ্ডুকতা, জীবনবিমুখতা তাঁকে যেমন পীড়িত করত তেমনি পাশ্চাত্যের ধর্মহীন কর্মের পিছনে ধাবিতে হওয়া, নীতি-নৈতিকতাহীন বিশৃঙ্খলা জীবনযাপন তথা উন্মার্গগামীতাও তিনি সুস্থ জীবন বলে মেনে নিতে পারেননি।

ইকবালের চিন্তা ও চেতনায় ছিল রুমীর মর্দেমুমিনের আদর্শ। পূর্ণ মানবের শক্তিসত্তা। যেখানে নজরুল ঘোষণা করেছিলেন—

বলবীর
বল উন্নত মম শির
শির নেহারী আমারই নত শির
ঐ শিখর হিমাদ্রীর (বিদ্রোহী)।

অর্থাৎ মানুষ হবে এমন শক্তিধর, এমন সমুন্নত উচ্চশির, যে তাকে দেখে স্পর্ধিত হিমালয়ের শিখরও মাথা নত করবে।

ইকবাল বলেন— You have come here shining more brightly than the Sun which lightens the whole World, live in such a way as to throw light over every atom of dust; অর্থাৎ তুমি সূর্যের চেয়ে উজ্জ্বলতর আলো নিয়ে পৃথিবীতে এসেছ, যে সূর্য সারা পৃথিবীকে আলোকিত করে। তুমিও এমন জীবনযাপন কর যাতে প্রতিটি ধূলিকণা আলোকিত হয়। এই আত্মশক্তিসম্পন্ন, আত্মবিশ্বাসী মানুষ পারে আল্লাহ্‌র নৈকট্য অর্জন করতে। পারে অসম্ভবকে সম্ভব করতে। অলৌকিক ঘটনা ঘটাতে। এই আত্মপ্রত্যয়ী ইনসান-ই-কামিল (Perfact man) বা পূর্ণমানব প্রসঙ্গে ইকবাল বলেন—

মুমিন বান্দার হাত স্বয়ং আল্লাহ্‌র হাত
তিনি শক্তিশালী, সৃষ্টিধর্মী, সাহসী ও সুদক্ষ।
মানুষ হয়েও ফেরেশতা স্বভাবের অধিকারী,

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রভুর গুণে গুণান্বিত
উভয় জগৎ থেকে হৃদয় তাঁর মুক্ত
তাঁর সাধ-আশা সামান্য, তাঁর লক্ষ্য উচ্চ।

অর্থাৎ এক দিকে তিনি হবেন এমন শক্তিধর যিনি ইঙ্গিতে আসমানও টলাতে সক্ষম। অপরপক্ষে তিনি হবেন আত্ম উদাসীন সুখে-দুঃখে ভ্রুক্ষেপহীন উর্ধলোকের বাসিন্দা। ইকবাল বলেন—

বীরপুরুষের নীতি হল সত্য ভাষণ ও সাহসিকতা
আল্লাহ্‌র সিংহ শৃগালের শঠতা জানে না।

অর্থাৎ শঠতা কপটতা ধূর্ততা হিংস্রতা কখনো মানব-স্বভাব-সুলভ হতে পারে না। ইনসানিল কামিলের মন হবে আকাশের মতো উদার, ক্ষুদ্রতা, নীচতা তার কাছে ঘেঁষতে পারে না। তাই বলেন—

খোদা-পাগল দরবেশ না প্রাচ্যের না প্রতীচ্যের,
আমার দেশ ইস্পাহান, না দিল্লি, না সমরকন্দ।

মুসলিম রেনেসাঁর কবি ইকবাল

নজরুল ইসলাম যেমন অধঃপতিত দুঃখ-দুর্গত মুসলিম সমাজকে জাগ্রত করার জন্য প্যান ইসলামিজম বা মুসলিম জাগরণের কবির ভূমিকা পালন করেছিলেন, মহাকবি ইকবালও বিশ্বজুড়ে মুসলিম পিছিয়ে পড়া জাতিকে নিয়ে চিন্তিত ছিলেন এবং বেদনাবোধও করেছিলেন। কবিরা যুগের নায়কের ভূমিকা পালন করে থাকেন। যুগ-ধর্মকে উপেক্ষা করা প্রকৃতপক্ষে মানবাত্মার প্রতিই বিশ্বাসঘাতকতা করা।

কবি হিসেবে ইকবাল তাই ভিক্টোর হুগোর মতো গোর্কির মতো, টলস্টয়ের মতো জাতীয় জাগরণে চারণকবির ভূমিকা পালন করেছিলেন। অধঃপতিত ভাগ্য-লাঞ্ছিত দুর্দশাগ্রস্ত জাতির সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। জনৈক সমালোচক বলেছেন— Some men are like rain, God's gift to mankind. The shower comes on a dry, parched and arid land and it begins to bloom and blossom with Gold and glory. Great souls with their teachings resuscitate the dead humanity and human corpses begin to bestir themselves with life and action. অর্থাৎ কোনো কোনো মানুষ খোদার দান—বৃষ্টির মতো ধরণীতে নেমে আসেন। বৃষ্টি যেমন শুষ্ক, উর্বর ভূমিকে সোনার ফসলে ভরে দিয়ে যায়, তেমনি মহাত্মারা তাঁদের শিক্ষার প্রভাবে মৃত মানবাত্মাকে জাগিয়ে তোলেন। তাঁদের ভিতর দেখা দেয় নবজীবনের স্পন্দন ও কর্মপ্রেরণা। ইকবালের জীবন ও কর্মের মধ্যে এই উক্তির সত্যতা লক্ষ করা যায়।

তাঁর কাছে সাহিত্য সাহিত্যের জন্য (Arts for Art's sake) নয়। তাঁর কাছে ছিল Art for man's sake। অর্থাৎ মানুষের জন্যই শিক্ষা। মানুষ মানুষের জন্য। মানুষকে বাদ দিয়ে, হৃদয়কে বাদ দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে যুক্তি দিয়ে শিল্প কখনো প্রকৃত শিল্প-কর্ম হতে পারে না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাই কবি বলেন—

হৃদয়ের রক্ত বিনা সকল ছবিই প্রাণহীন
হৃদয়ের রক্ত বিনা সকল গানই অর্থহীন।

এ যেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়—

জীবনে জীবন যোগ করা
না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পশরা।

সমালোচক বলেছেন— Poets are trumptes which sings to battle. অর্থাৎ কবির লেখনী প্রকৃতপক্ষে হবে যুদ্ধের হাতিয়ার। লেখনী হবে বিউগলের ধ্বনি। কবির বীণা হবে অগ্নি-বীণা যার দীপক রাগিনী ঝংকারে মুমূর্ষু রোগীও হৃত সম্বিত ফিরে পাবে। বিশল্যকরণী মৃতসঞ্জীবনী সুধা পান করে মৃতেরা সঞ্জীবীত হয়ে উঠবে। তাঁরাই পারেন মৃতের শিয়রে বসে জীবনের তকবীর শোনাতে। যাঁদের বাণীতে 'জাগিয়া উঠিবে রোগী শয্যার উপরে।' মহাকবি ইকবাল সে কথাই বলেছেন সরাসরিভাবে –The highest art is that which awakens our dormant will-force and nerves us to face the trials of life manfully. ইকবালের সাহিত্য তাই প্রকৃতপক্ষে হয়ে উঠেছে মৃতপ্রায়, পঙ্গু জাতির জন্য এক অপূর্ব আবেহায়াত, মুসলিম জাহানের ধমনীতে এনে দিয়েছে ইসলামি যুবকের তর-তাজা রক্ত। পদানত হতাশাগ্রস্ত পশ্চাদপদ মুসলিমদের দেখে মর্মাহত কবি জাতিকে মাথা উঁচু করে ফিরে দাঁড়াবার আহ্বান জানিয়ে বলেন—

সবক লে সদাকাত কা
আদালত কা
রিয়াজাত কা
লিয়া জায়েগা তুঝসে কাম ইমামত কা।

অর্থাৎ হে মুমিন তুমি যদি সত্যানুসারী হও, ন্যায়পরায়ণ হও, সাহসী হও তাহলে নেতৃত্বের ভার তোমাকেই দেওয়া হবে। অর্থাৎ মুসলমান আজ পদচ্যুত হয়েছে পথ-চ্যুত হওয়ার জন্যই। কোরআন আর হাদিসের অনুসারী হয়ে মুসলিমরা আধা জাহানের অধিকারী হয়েছিল। হেলালী-ঝাণ্ডা ইয়োরোপ পর্যন্ত উড্ডীন হয়েছিল। আজ যে আল্লাহ্-নির্ভরতা, সততা, একতা, সৌভ্রাতৃত্ব ত্যাগ করেছে বলেই বিশ্বজুড়ে সে লাঞ্ছিত হচ্ছে।

আল্লামা ইকবাল তাই আরো বলেছেন—

ওহ্ জমানে মেঁ মুয়াজ্জ থে মুসলমাঁ হো কর্
আউর তুম খোয়ার হুয়ে তারিকে কুরআন হো কর্।

অর্থাৎ বিগত দিনে তুমি সম্মানের অধিকারী ছিলে, আর আজ তুমি নিকৃষ্ট জাতিতে পরিগণিত হচ্ছ কোরআনের পথ ছেড়ে দিয়ে।

তাই দুঃখ করে কবি এও বলতে চান—

আজানের প্রথা রয়ে গেছে কিন্তু বেলালের রুহ আর নাই
দর্শন রয়ে গেছে কিন্তু গাজ্জালীর শিক্ষা আর নাই।

কবির আফশোস, শত আফশোস জাতির বর্তমান হাল দেখে, তাই বলেন—

তুম্ মেঁ হুঁরো কা কোয়ি চাহ্নেওয়ালা হি নেঁহী
জুলওয়ায়ে তুর তো মওজুদ হ্যায় মুসা হি নেহীঁ।

অর্থাৎ তোমাদের জান্নাতের সুখ-স্বপ্নের প্রার্থীই তো নেই, সেই কুদরতের তুর পাহাড় তো আজও মওজুদ—সেই মুসাই তো নেই।

অর্থাৎ মুসলিম তার অতীত ইতিহাস-ঐতিহ্য সেই ঈমানী যোগ্যতাই হারিয়ে ফেলেছে। তার জন্যই তার এই দুর্ভোগ।

কবির তাই আহ্বান পুরোনো স্বর্ণোজ্জ্বল অতীতকে ফিরে পেতে হলে সেই পূর্বের ঈমানী রঙেই নিজেদের রঞ্জিত করতে হবে।

তাই কবি বলেন—

গৌরবোজ্জ্বল অতীতকে আমি আমার সামনে দেখি
গতকালের আয়নায় আমি আগামীকালকে দেখি।

আশাবাদী কবি তাই প্রত্যয়-দীপ্ত কণ্ঠে আওয়াজ তোলেন—

তওহীদের আমানত আমার সিনায়
দুনিয়া থেকে আমাদের মুছে ফেলা সহজ নয়।

এ যেন কবির সত্যোক্তি—

কত্লে হোসেন অস্লেমে কত্ল এজিদ হ্যায়
ইসলাম জিন্দা হোতা হ্যায় হর করবলাকে বাদ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইকবালের শিল্প-ভাবনা

হজরত মুহাম্মদ (স.)-এর মতে কবি দু'ধরনের। সুকবি এবং কুকবি। অর্থাৎ সাহিত্য হবে সত্য-সুন্দরের অনুসারী। সাহিত্যেনীতি-নৈতিকতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা মানবিকতা বোধ অবশ্যই থাকতে হবে। অপরপক্ষে অশ্লীলতা কদর্যতা যৌনতা অশালীনতা কখনো সাহিত্য-পদবাচ্য হতে পারে না। ঋষি টলস্টয় যাঁকে ইউরোপের বিবেক বলা হয় তিনিও সাহিত্য-শিল্পে মানবমুখীনতার উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। ড. হাসান জামানের মতে সাহিত্য বা শিল্পকে শুধু মানবিকতাবোধে বিশ্বাসী হলেই হবে না তাকে মানবকল্যাণ বোধেও উত্তীর্ণ হতে হবে। প্রত্যেক মহাকবির কাব্যেই মানুষই হয়ে উঠে কাব্যের মূল উপজীব্য। গোর্কি, নজরুল প্রমুখের কাছে সাহিত্য শুধু আনন্দ-সুন্দর রূপেই নয় বেদনা-সুন্দর রূপেও অনুভূত হয়েছিল। কবিরা তাই যেমন দ্রষ্টা তেমনি স্রষ্টাও। তাঁরা শুধু সুন্দরের পূজারী নন, সত্যের উপাসকও বটে।

তাঁরা দেশ-কাল-জাতি-ধর্মের উর্ধে অবস্থান করেন বলেই তাঁরা শুধু স্বদেশ এবং সমকালিন না হয়ে, হয়ে ওঠেন সকল কালের সকল যুগের সকল মানুষের আত্মার আত্মীয়, আপনজন। মহাকবি ইকবালের দৃষ্টিতে তাই ধরা পড়ে সমগ্র মানবের প্রতিচ্ছবি।

মনুষ্যত্ব হল মানুষের মর্যাদাবোধ,
সুতরাং মানুষের মর্যাদা সম্বন্ধে অবহিত হও।
আল্লাহ্‌র বান্দা আল্লাহ্‌র পথ গ্রহণ করে
কাফির ও মুমিন সকলের প্রতি সে অনুরাগী হয়।

কবির মতে কবিরা তাই বিশ্বজনীন শিল্প-সাহিত্যের স্রষ্টা। মানুষের সুখে মানুষের ডাকে তাঁদের হৃদয় অতন্দ্রপ্রহরী। দুঃখ-বেদনাময় মরু-জীবনে তরু হয়ে ফুল ফোটানো

আনন্দ জাগানো আশা বিলানোই তাঁদের ধর্ম। তাই বলেন—

শিল্পের লক্ষ্য হল অনন্ত জীবনের উত্তাপ
অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত ক্ষণস্থায়ী দুএকটি
শ্বাস-প্রশ্বাস নয়।

ইকবালের কাছে শিল্প তাই শুধু শিল্পসম্মতই নয় তাকে চিরন্তনত্বও অর্জন করতে হবে। রাখতে হবে অন্তরের সঙ্গে অন্তরের মেলবন্ধন। আর মানবাত্মার জাগরণ ঘটানোর জন্য চাই বজ্র-বীণার দীপক ঝঙ্কার। তাই বলেন—

অলৌকিক কার্যকলাপ ছাড়া কোন জাতির উত্থান হয় না,
যে শিল্পে মুসার আসার শক্তি নেই, সে আবার শিল্প কিসের?

এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিলেন নজরুলও।

ঊষার দুয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব রাঙা প্রভাত
আমরা টুটাব তিমির রাত
বাধার বিন্ধ্যাচল।

টলস্টয়, রাস্কিন, প্লুটো, বানার্ডশ প্রমুখ ছিলেন এই মতবাদে বিশ্বাসী। শেলী, কীটস, ওয়র্ডসওয়র্থের মতো রোমন্টিক কাব্যের ছোঁয়া তাঁর মধ্যে লাগলেও ক্লাসিকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বজায় রেখেছেন। ক্লাসিক এবং রোমান্টিকতার মধ্যে তিনি সমন্বয় সাধনের পথ দেখিয়েছেন। তাই বলেন—

কবি দ্বন্দ্বমুখর জীবন থেকে দূরে থাকবে না,
কারণ ঐ প্রকার কাব্য বহুজাতির ভাগ্য বিপর্যয় ঘটায়।

মাটির মমতা-রসে সিক্ত কবির দুর্বার মন মরু-কাফেলার 'হুদী' গান গেয়েছেন—'আর একটু দ্রুত পা চালাও—মনজিল আমাদের দূরে নয়।'

তার অর্থ—জীবন হবে চলমান। গতিশীল। স্রোত হারালে নদী জীবনহীন বদ্ধজলাশয়ে পরিণত হয়। এ যেন নজরুলের অনুদিত 'অগ্রপথিক' কবিতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়—

অগ্রপথিক রে সেনাদল/জোর কদমে চলরে চল!

শুধু বাস্তববোধোদ্দীপ্ত নয়, রোমন্টিক প্রেমের কিংবা বীর্যব্যঞ্জক কওমী কবিতাই নয়—ইকবাল অতীন্দ্রিয়বাদী সুফীতাত্ত্বিক কবিও ছিলেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সৃষ্টির

pdf By Syed Mostafa Sakib

সঙ্গে সঙ্গে রূপ-রহস্যের কবিতাও লিখেছেন তিনি।

ঊর্ধে আকাশ নীলাভ, বাতাস আনন্দে মাতোয়ারা,
ঐ দেখো পাহাড়ী-নদী লাফাতে লাফাতে নাচতে নাচতে
ধাক্কা খেতে খেতে ছুটছে।
একটু দেখো সুন্দরী, রূপসী সাকী
নদী কেমন জীবনের বাণী আমাদেরকে শোনাচ্ছে। (সাকীনামা)

অন্যত্র আছে—

হেমন্তের ফুলের পাপড়িগুলো ঝরে ঝরে পড়ছে
ঘুমন্ত শিশুর হাত থেকে যেন খসে পড়ছে খেলনা।

কি অপূর্ব ব্যঞ্জনা—

যদি ফুলের একটি পাপড়ি বাতাসের আঘাত পায়
আমার চোখ দিয়ে তা অশ্রু ঝরিয়ে দেয়।

অর্থাৎ কবি একদিকে যেমন বজ্র-বিষাণ অপরদিকে তেমনি কুসুম-কোমল প্রাণ। দ্বৈত সত্তার একক অধিকারী। সব বড় কবির ধর্মই বুঝি তাই।

আবার অন্যত্র তাঁর প্রেমিক মন আল্লাহ্‌র ধ্যানে সদাই মগন—

পাহাড়, পর্বত, সমুদ্র ও সূর্যাস্ত
সর্বত্র খোদাকে অবগুণ্ঠিত দেখলাম।

অর্থাৎ ফরিয়াদের কবির মতো—

যতটুকু হেরি বিস্ময়ে মরি ভরে উঠে সারা প্রাণ
এত ভালো তুমি, এত ভালোবাসো এত তুমি মহীয়ান
ভগবান! ভগবান।

সব শেষে মারেফাত-তত্ত্বের কথা কবি বলেছেন যা সব কিছুকে হার মানায়।

জ্ঞান, হৃদয় ও দৃষ্টির প্রথম মুরশিদ হল ইশ্‌ক্
ইশ্‌ক না থাকলে শরীয়ত ও দ্বীন কাল্পনিক মূর্তিপুজা।

তাঁর কাব্যালোক সম্পর্কে উদ্ধৃতি না বাড়িয়ে সমালোচক অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে সহমত হয়ে বলা যায়— কবি ইকবালের বাড়ির দরজাটা খুলে মনে হল মধ্য এশিয়ার বিস্তৃত অঙ্গনে এসে পৌঁছেছি যেদিকে লাহোরের কাবুলি দরোয়াজা খোলা। উত্তর

ভারতের মুক্ত হাওয়া ইকবালের কথাবার্তায়, তাঁর দরাজ ব্যবহারে, ঘরের পাঞ্জাবি-আফগানী সরঞ্জামে। তাঁর শরীর অসুস্থ ছিল। পরনে তাঁর ধবধবে পিরান, কালো পায়জামা। তাঁর সৌজন্য সুন্দর বললে সব বলা হয় না, যেন ব্যবহারের একটি শিল্পকাজ। আভিজাত্য পুরানো পশমিনার উপরে কাশ্মীরী ফুলের মতো দুর্লভ সামগ্রী। অথচ প্রখর যুগ-সচেতন মন, হাস্যোজ্জ্বল। একেবারে ভারতীয় এবং আধুনিক তাঁর চিন্তার সৌকর্য। জানতাম এই কবি দামাস্কাস, কায়রো থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত পারসিক উর্দু ভাষায় লোকের হৃদয় নাড়িয়েছেন। ভারতবর্ষব্যাপী তাঁর 'হিন্দুস্তান হামারা' গানের ঢল। কেম্ব্রিজের ইনি মেধাবী পণ্ডিত, এঁর মতো চোস্ত ইংরেজি গদ্য কম ভারতীয় লিখেছেন। অথচ কত হালকা তাঁর জ্ঞানের ভার, সহজ দিলদরিয়া ভাব। বুঝলাম একেই আমরা কস্‌মোপলিটান মন বলি, যা স্বদেশি অথচ প্রসারি, যেখানে লেনদেন চলছে বড়ো চত্বরে, নানাদেশীয় আধুনিক-প্রাচীনে সমন্বয়।"

মূলত ইকবাল বিশ্বমানবতার কবি। দেশপ্রেম, জাতিপ্রেম, ধর্ম-ভীরুতা তাঁকে খণ্ড ক্ষুদ্র করে দেখতে শেখায়নি। কোনো সংকীর্ণতা, সংকীর্ণ-জাতীয়তা, স্বাজাত্যপ্রেম সত্ত্বেও তিনি তাঁর ঊর্ধে ডানা মেলতে পেরেছিলেন বলেই তিনি শুধু উপমহাদেশের নন, লাহোরের নন, পাকিস্তানের নন, তিনি বিশ্বের কবি হতে পেরেছেন। তিনি বলেছেন— মজহাব নেহি শিখাতা আপস্‌মে বৈর রাখ্‌না—অর্থাৎ ধর্ম কখনো পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা বা বৈরীভাব রাখতে শেখায় না। অনুরূপ তিনি নিজের পরিচয় নিজেই দিয়েছেন—

আমি খোদার পাগল এক দরবেশ, না প্রাচ্যের না পাশ্চাত্যের
আমার দেশ না ইস্‌পাহান, না দিল্লি, না সমরকন্দ।

বলেছেন—উপলব্ধি করো সেই আত্মাকে, যা প্রাচ্যেরও নয়, পাশ্চাত্যেরও নয়, এ হচ্ছে অমূল্য রত্ন, যা ফেরেশতা জিবরাইলের কাছেও তোমার বন্ধক রাখা উচিত নয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কবি ইকবালের মূল্যায়ন

প্রকৃতির ধেয়ানী কবি ওয়র্ডসওয়র্থ কিংবা সৌন্দর্যের পূজারি কীট্‌সের Truth is beauty, beauty is truth-এর মতো কবি ইকবালও সৌন্দর্যকে ভালোবাসতেন। কিন্তু সে শিল্প জীবন-বিচ্ছিন্ন একথা তিনি ভাবতে পারতেন না। শিল্পের জন্য শিল্প —একথা তিনি মেনেও নিতে পারেননি।

নজরুল যেমন বলতেন—সাহিত্যের সঠিক সংজ্ঞা কি আমি তা জানিনে, জানলেও মানিনে। নজরুলের মতো ইকবালও মনে করতেন—শিল্প-সাহিত্য জীবনকে কেবল সুন্দরই করে না, তাকে শক্তিশালীও করে। অর্থাৎ একইসঙ্গে সত্য ও সুন্দরকে নিয়েই সাহিত্যের শিল্পের চিরন্তন কারবার। কবি গোলাম মোস্তফার মতে—সত্যের সাথে শক্তি মিলিলে গতি হয় তার দুর্নিবার। তাই ইকবালও ছিলেন সত্য-সুন্দর এবং শক্তি-সুন্দরের উপাসক। তাঁর মতে—ব্যক্তি-জীবনে ও জাতীয় জীবনে সাহিত্য-শিল্প করবে আশা ও আলোকের সম্ভার। আমাদের হতাশা-দীর্ণ জরাজীর্ণ অবসাদগ্রস্ত মনে আজকে বিপুল আশা ও উদ্দীপনার জোয়ার। জীবনকে শক্তিহীন প্রাণহীন নিষ্ক্রিয় করে শিল্প শুধু সৌন্দর্যের সুকুমার প্রবৃত্তিগুলির চর্চায় লিপ্ত থাকবে না, বরং জীবনকে তা করে তুলবে বলিষ্ঠ ও কর্ম-চঞ্চল। তাঁর মতে— The ultimate end of all human activity is life –glorious, powerful, exuberant. তিনি বলেন— The highest art is that which awakens our dormant will-force and nerves us to face the trials of life man-fully অর্থাৎ যা আমাদের সুপ্ত-শক্তিকে জাগ্রত করে, যা জীবনকে নতুন শক্তিতে উজ্জীবিত করে, যা সমস্ত দুর্বলতাকে জড়তাকে নৈরাশ্যকে কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে তাই প্রকৃত সাহিত্য এবং সাহিতিক্যের কাজ। হাফিজের ভাষায় বলা যায়—

এমন কেতাব লিখবে তোমার মূল্যবান কলম দ্বারা
যেন দেখলে তাহা বিচার দিনে জুড়ায় তোমার নয়ন-তারা!

কবি ইকবাল তাই বলেন— Thehe should be no opium-eating in Art অর্থাৎ সাহিত্য কোনো গাঁজাখুরির ব্যাপার নয়। তাঁর মতে—The dogma of Art for the sake of Art is a clever invention of decadence to cheat us out of life and power. সুতরাং শিল্পের জন্য শিল্প তাঁর কাছে ভাঁওতাবাজি ছাড়া কিছু নয়। তাঁর মতে—জীবনের রূপায়নে, জীবনের স্ফূরণে জীবনের সার্বিক বিকাশ সাধনে যার ভূমিকা যত সক্রিয় তা তত মূল্যবান।

সাহিত্যের এই সত্য ও শক্তির রূপকেই নজরুল দেখেছেন 'প্রেম ও প্রহার' রূপে। তিনি বলেছেন—

বহু তপস্যা করিয়া জেনেছি ভাই
প্রেম জাগাইতে প্রহারের মতো অমোঘ ওষুধ নাই।

অর্থাৎ কবির লেখনী কখনো তরবারি হয়ে ওঠে অন্যায়ের বিরুদ্ধে। অসত্যের বিরুদ্ধে। অসুন্দরের বিরুদ্ধে। জেহাদী কবির উক্তি—আনো উদ্ধত মুক্ত কৃপাণ বিজলী ঝলক ন্যায়-অসির। আকাশে-বাতাসে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল না থামা পর্যন্ত কবির লেখনী যুদ্ধ তাই চলতেই থাকে। শিল্পীর আর এক চক্ষু হচ্ছে ক্ষুদ্রকে বৃহৎ, অসুন্দরকে সুন্দর, অপ্রকাশকে অপরূপ করে প্রকাশ করা। এই দৃষ্টিই পূর্ণত্বের দৃষ্টি। সসীমের মধ্যে অসীমকে অনুভব করা, আশা দিয়ে ভাষা দিয়ে তাহে ভালোবাসা দিয়ে মননলোককে আলোকিত করাই কবি-কর্ম। এদিক দিয়ে কবি কল্পলোক-বিহারী নন্দন-বনচারী। ইংরেজি কবি Blake মনে করেন An Artist who has not travelled upto heaven at least in his imazination and thought is no Artist at all.

প্রকৃতপক্ষে যাঁর হৃদয় যত প্রশস্ত, যাঁর অনুভূতি হত সূক্ষ্ম, যাঁর মন যত উদার ও স্বচ্ছ তিনি তত বড় শিল্পীসত্তার অধিকারী। ইকবাল তাই বলেন—মানুষের কাছেই পৌঁছতে পারনি, আল্লাহ্‌কে খোঁজ কেন? অর্থাৎ ইকবাল যেমন বাস্তবজগতের বাসিন্দা ছিলেন তেমনি অতীন্দ্রিয়লোকের গূঢ়-তত্ত্বেরও তিনি সন্ধান রাখতেন। John Hoywood তাই ইকবাল সম্পর্কে বলেছেন—To Iqbal, the poet's function was to stir and stimualate his reads, the poet had some of the attributes of the Prophet. তাঁর মতে 'Nations' are born in the hearts of poets.

যেকোনো মানদণ্ডেই বিচার করা হোক না কেন ইকবাল একজন পরিপূর্ণ কবি। বহুমুখী প্রতিভার দিগন্তবিস্তারী শক্তিমান কবি। যেখানে ভণ্ডামি, যেখানে অনাচার, যেখানে মানবাত্মার হীন অবমাননা সেখানে তিনি তত অসি খরশান জেহাদী ফরমান জারি করেছেন। তাই বিদ্রোহী কবির ন্যায় বলেন—

সতধর্ম অধর্মের চেয়ে নিকৃষ্ট হয়ে গেছে,
কারণ মোল্লা, যদিও ধার্মিক তবুও সে মানুষকে
বেইমান বলে আখ্যায়িত করে।
কাফিরের ধর্ম হলো চেষ্টা-সাধনার তদ্‌বীর
আর মোল্লার ধর্ম হলো আল্লাহ্‌র নামে অশান্তি সৃষ্টি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অর্থাৎ মানুষের প্রতি ফতোয়াবাজি তাঁর কাছে জুলুমবাজির সমান। হৃদয়হীন মোল্লা-পুরুতের সকল দুয়ারে চাবি আঁটা তিনি পছন্দ করেননি।

কবির বিশ্বাস—

কবিতার লক্ষ্য যদি হয় মানুষ গড়া
তাহলে কবিরা পয়গম্বরদেরই উত্তরসূরী।

তাই সতর্ক করে বলেন—

ঐ কবিদেরকে অবজ্ঞা করো না, কেননা ওদের
কাব্যে কবিতা ছাড়াও মহত্তর উদ্দেশ্য আছে।

কবিরা যেমন মঙ্গলের দূত হয়ে আসেন তেমনি অমঙ্গল ডেকে সর্বনাশ সাধনের শক্তিও তাঁদের আছে। তাই তাঁর ধারণা— The spiritual health of a people largely depends on the kind of inspiration which their poets and Artists receive. কবির সূক্ষ্মদর্শিতা, অনুভব-যোগ্যতা ও তাত্ত্বিকতার জন্য বলা হয়— তত্ত্বদর্শীদের দৃষ্টিতে ইকবাল পয়গম্বরীর অনুরূপ কাজ করেছেন যদিও তাঁকে পয়গম্বর বলা যাবে না। ইকবালের মানসগুরু মরমী কবি রূমী সম্পর্কে যেমন বলা হয় —(মসনবীর জন্য) *নবী নয়, তবু তাঁর রয়েছে কেতাব!*

সমালোচক গোলাম রসুলের বিচারে— ইকবাল কেবল মুসলিম রেনেসাঁর কবিই ছিলেন না, তিনি ব্যাপক অর্থেও কবি ছিলেন। যেমন ছিলেন—রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলাম এবং আরো অনেকে। ইকবালকে সাধারণত মুসলিম জাগরণের কবি বা ইসলামের কবি হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়, কিন্তু একথা পুরোপুরি সঠিক নয়। যে ইকবাল-কাব্যের সমস্ত কিছু অধ্যয়ন করেনি, তার পক্ষে এ ধারণা করা স্বাভাবিক। কিন্তু যিনি গোটা ইকবাল-কাব্য ও ইকবালের চিন্তাধারার খবর রাখেন, তিনি এমন কথা কখনো বলতে পারেন না। বস্তুত ইকবাল বিশেষ গোত্র বা জাতির কবি ছিলেন না। মুসলমান হিসাবে তাঁর চোখের উপর মুসলমানদের যে অবনতির চিত্র দেখেছিলেন, তাতে স্বাভাবিকভাবে তাঁর মতো ভক্ত মুসলমান ব্যথিত হয়ে মুসলমানদের পরিত্রাণের জন্য লেখনী ধারণ করেছিলেন। যে উদ্দেশ্যে তিনি লিখেছেন—'শিক্ওয়া' ও 'জওয়াব-ই-শিক্ওয়া'। কিন্তু তাঁর বেশিরভাগ কাব্যগ্রন্থ বিশ্বমানবের জন্য লেখা। যেগুলোর আবেদন সার্বজনীন।

লেখক অমিয় চক্রবর্তী তাঁকে অত্যন্ত নিকট থেকে দেখেছিলেন। তাই কাব্যবিচার শেষে মন্তব্য করেছেন— The ultimate evocative power of his poetry lies in his profound humanity.

ইকবালের খুদী দর্শন

ইকবাল শুধু কবি নন, তিনি দার্শনিকও। শুধু শরীয়তপন্থী নন, তিনি তরীফত মারেফাৎপন্থীও। তাঁর পূর্বসূরী হিসেবে তিনি মাওলানা জালালুদ্দিন রুমীর ভাব-শিষ্য। তাঁর আত্মদর্শন খুদী-দর্শন খোদ্‌কে ঘিরেই। সংস্কৃতে বলা হয়— আত্মানাং বিদ্ধি। অর্থাৎ নিজেকে চেনো, নিজেকে উপলব্ধি করো — তাহলেই ঈশ্বর-দর্শন সম্ভব হবে। নজরুল ইসলাম বিদ্রোহী, বিপ্লবী কবি হলেও তিনিও ছিলেন সুফী তাত্ত্বিক মিস্টিক কবি। তিনিও ছিলেন ভূয়ো-দর্শনের অধিকারী। তিনি তাই বলেছেন— 'তুই খোদ্‌কে যদি চিন্‌তে পারিস/ চিনবি খোদাকে।' আর এক কদম এগিয়ে বলেছেন— তারে যে চিনতে পারে রয়না ঘরে হয় সে উদাসী। কিংবা তাঁর সাথে ভাব হয় যার তার অভাব থাকে না কোনো!'

ইকবাল তাঁর 'শিকওয়া' ও 'জওয়াবে শিকওয়া'তে সেই ভাবই প্রকাশ করেছেন। একদিকে মুসলমানদের দুঃখ-দুর্দশা-দুর্গতির জন্য ভাগ্যবাদীরা আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ জানাচ্ছে। নজরুলের ভাষায়—

তুমি যদি সবের কর্তা তবে কেন এমন হয়
কেউ হাসে কেউ হাঁদে কেন কেউ সুখে কেউ দুঃখে রয়?

মহাকবি ইকবালও বলেছেন—

রহমাতেঁ হেঁ তেরী আগ্‌য়ারকে কাশানুঁপর
বারক্ গিরতি হ্যায় তো বেচারে মুসলমানুঁ পর!

এই অভিযোগের জবাবে আল্লাহ্‌র পক্ষ হয়ে কবি নিজেই উত্তর দিয়েছেন—

তুম মেঁ হুঁরো কা কোয়ি চাহ্‌নেওয়ালা হি নেহীঁ
জুলওয়ায়ে তুর তো মওজুদ হ্যায় মুসা হি নেহীঁ।

কবি ১৯০৫ থেকে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত তিন বৎসর ইউরোপে কাটিয়েছেন। তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন পাশ্চাত্যবাসীর অফুরন্ত জীবনীশক্তি, অভাবনীয় কর্ম-দক্ষতা ও সীমাহীন উদ্যম। যা তাদের জীবনে এনে দিয়েছে বিরাট সাফল্য ও অসাধারণ সাফল্যতা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

যা প্রাচ্যবাসীর মধ্যে দুর্নিরীক্ষ। কিন্তু পাশ্চাত্যবাসীর এই ভোগৈশ্বর্য ও শক্তি-উন্মত্ততা তাদেরকে করে তুলেছে হিংস্র। দিয়েছে বিজ্ঞান-নির্ভর হৃদয়হীনতা। মানবতা কেঁদে মরেছে ধর্মহীন মদ-মত্ততায়।

কবি তাই এই অন্তঃসারশূন্য বাহ্যিক চাকচিক্য দেখে খুশি হতে পারেননি। সভ্যতা-গর্বী আত্মান্ধ ঈশ্বরবিহীন মানুষের এই উন্নতিকে প্রগতিকে, আত্ম-ধ্বংসী বিপ্লব বলেই মনে করেছেন।

তিনি তাই বলেন—

বাহিরের পরিবর্তনে তার রূপ বদলাবে না
কেবল বাহিরটাই বারে বারে নতুন রূপ ধারণ করবে।

ইকবালের খুদী দর্শন প্রকৃতপক্ষে শক্তি-দর্শনেরই যেমন একটি রূপ তেমনি আত্মবিনাশ না করে আত্মবিশ্বাস দ্বারা 'খুদী'র বিকাশ সম্ভব এবং মারেফাতের ইনসানুল কামেল (Perfect man), রুমী যাকে বলেন— মর্দে-মুমিন সেই stage-এ পৌঁছানো সম্ভব। নজরুল ইসলামও সেই ধারণাই পোষণ করতেন—

আল্লাহ্‌তে যার পূর্ণ ঈমান কোথা সে মুসলমান
কোথা সে আরিফ অভেদ যাহার জন্ম-মৃত্যু জ্ঞান।
কোথা সে মুসলমান।।

ইকবাল তাঁর 'আসরার-ই-খুদী'তে ও 'রামুজ-ই-বেখুদী'তে প্লেটোনিক দর্শনকে অস্বীকার করেছেন কেননা তা অদৃষ্টবাদী যা মানুষের উদ্যম অধ্যবসায় ও কর্ম-তৎপরতাকে নিষ্ক্রিয় ও নিস্পৃহ হতে সাহায্য করে।

এমনকি তিনি এক সময় সুফী শ্রেষ্ঠ হাফিজের মোহ থেকেও মুসলমানকে সতর্ক হতে বলেছিলেন—

সাবধান হাফিজ থেকে...
তিনি কেবল গান করতে ও মানুষকে বিভ্রান্ত করতে জানেন,
তাঁর সুরা ভরা পাত্র দূরে টেনে ফেলে দাও,
কারণ তাতে তিনি কেবল বিষ ঢেলেছেন।

তিনি মনে করতেন There should be no opium-eating in Art. তিনি এও মনে করতেন—

জীবনের সন্ধান দৃঢ়তাতেই নিহিত—
দুর্বলতাই তো তুচ্ছতা ও অপরিপক্কতা।

তিনি মনে করতেন—

তোমার কাঁচা ও অধোগামী সত্তার জন্যই তুমি ঘৃণিত, অপমানিত
তোমার নরমশরীর ও আরামপ্রিয়তাই তোমায় পুড়িয়ে মারছে।
মিথ্যা ভয়, দুঃখ ও সন্দেহ পরিত্যাগ করো—
পাথরের মত কঠিন ও হীরার মত দামী হও।

* * *

বারবার নিজেকে শানের পাথরে আঘাত করো,
তীক্ষ্ণধার তলোয়ারের চেয়ে তীক্ষ্ণতম পাথর হও,
দুঃখ-শোকেই মানুষের শক্তি-সামর্থ্যের পরীক্ষা হয়,

তাই কবির বাণী—

সৃষ্টি-সুখের উল্লাসেই জীবনের মূল নিহিত।
উঠো, জাগো নতুন জগৎ সৃষ্টি করো,
অগ্নি-শিখায় ঝাঁপিয়ে পড়ো—ইব্রাহিম হও।
দৃঢ় চরিত্র যে ব্যক্তির আত্ম-প্রত্যয় আছে
তার নিকট অদৃষ্টও নতি স্বীকার করে।

আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি মানুষ। সে আল্লাহ্‌র গুণে গুণান্বিত হবে। এবং আল্লাহ্‌র দেওয়া শক্তিতে সে সারা পৃথিবীর জড় ও জীবের উপর প্রভুত্বের অধিকারী হবে। সে এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো কাছে মাথা নত করবে না। কারো দাসত্ব করবে না। এটাই আল্লাহ্ দেখতে চান। তাই মানুষ ভীরু-মেষ হয়ে থাকতে পারে না। ঈগল পাখির মতো ভয়ে আত্মগোপন করে থাকতে পারে না।

তাই আল্লাহ্ যেন স্মরণ করিয়ে দিতে চান—

তুমি কি জীবিত? উদ্যমী হও সৃষ্টিধর্মী হও
আমার মতো সারা পৃথিবী বিজয়ী হও।
তোমার যা অযোগ্য, তা দীর্ণ-বিদীর্ণ করে ফেলো
তোমার আপন সত্তার নতুন জগৎ সৃষ্টি করো।
আজাদ মানুষের পক্ষে সবচেয়ে গ্লানিকর হচ্ছে
অন্যের সৃষ্ট জগতে নিঃশ্বাস গ্রহণ করা।

আল্লাহ্‌পাক যেন বলেন—

যে মানুষ সৃষ্টিক্ষম নয়
আমার চোখে সে জিন্দিক, সে কাফের।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাই তিনি বলেন—

আল্লাহ্‌র মানুষ! তরবারির মতো শানিত ও দীপ্ত হও
আপন সৃষ্ট-জগতের তুমি জীবন-শিল্পী হও!

অতীতচারী কবি জাতিকে স্মরণ করিয়ে দিতে চান—

তোমার দৃষ্টিতে কত হৃদয় বুকের ভিতর কেঁপে উঠত
আর আজ তুমি হারিয়ে ফেলেছ কালান্দারের জজ্‌বা।

তিনি নিজের জীবনাভূতি দিয়ে জীবনাকুলি জানিয়ে বলেন—

পশ্চিমের কত উপত্যকায় আমার আজান ধ্বনিত হয়েছে
তোমার বেগবতী স্রোত-ধারার কেউ গতিরোধ করতে পারেনি।

দুঃখজয়ী জেহাদী কবি দুর্দিনের বজ্র-বৃষ্টিকে মাথায় নিয়েই লক্ষ্যের পথে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম জারি রাখতে চান।

তিনি তাই বলেন—

খোদার বিধানের রহস্য কি জানো?
দুঃখ-কষ্টের মধ্যে জীবনযাপন করাই প্রকৃত জীবন।

তাঁর মতে—

শারাবী লোকদের আড্ডায়ও যোগ দেওয়া ভালো, তবু যে পীর
বিপদাপদকে ভয় করে চলে, তার মুরিদ হওয়া উচিত নয়।

তিনি বলেন—

তোমার নিজের মাটি থেকে তৈরি করো এমন আগুন, যার নজির নেই,
অন্যের ধার-করা আলো তোমার শোভা পায় না।

তিনি বলতে চান—খুদীকে এরূপ উন্নত কর যে, তোমার প্রতিটি ভাগ্য-লিপি লেখার পূর্বে খোদা যেন তোমার কাছে জানতে চান—কি তোমার অভিপ্রায়! (বালেজিব্রীল)

কোরআনপাকেও আল্লাহ্‌ স্বয়ং বলে দিয়েছেন—যতক্ষণ তোমরা তোমাদের অবস্থার পরিবর্তন না করো, ততক্ষণ আমি তোমাদের অবস্থার পরিবর্তন করি না।

কবিরও উক্তি—

নিজের সত্তা সম্বন্ধে অবহিত হও, ওহে আত্মবিস্মৃত,
তুমি বিন্দু বটে তবু সিন্ধুর মতোই সীমাহীন।

ইকবাল জাতীয়তাবাদী ও আন্তর্জাতিকতাবাদী কবি

ইকবাল যেমন কবি ও দার্শনিক ছিলেন, তেমনি ছিলেন রাজনীতিবিদও। তাঁর রাজনীতি ছিল ইসলামী ভাবাদর্শে লালিত ধর্ম-নীতির সঙ্গে যুক্ত। তিনি বিশ্বাস করতেন রাজনীতি থেকে ধর্মনীতি গেলে থাকে চেঙ্গিজী। সীজারের প্রাপ্য সীজারকে দাও, পোপের প্রাপ্য পোপকে, তিনি এ নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। রাজনীতির জন্য রাজনীতি তিনি তা পছন্দ করেননি। ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার সমষ্টিগত নয়, এটাও তিনি মানতে চাননি। হজরত মুহাম্মদ (সা.) যেমন মদিনায় ইহুদি এবং খ্রিস্টানদেরকে নিয়ে এক সূত্রে গ্রথিত করে ধর্মরাজ্য স্থাপন করেছিলেন, যেখানে সবাই নিজ নিজ ধর্মমত স্বাধীনভাবে পালন করতে বদ্ধপরিকর ছিল। খলিফারাও অনুরূপ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ধর্মনিরপেক্ষতার চরম এবং পরম আদর্শ। যেখানে সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সার্বিক অধিকার অক্ষুণ্ণ ছিল। এই Tradition বজায় ছিল ক্রুসেডের যুদ্ধের (১০৯৭-১২৭৯ খ্রি.) অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত। শুধু তাই নয় ইসলামী নীতি অনুসারে মুসলিম নবাব-বাদশাহ-সুলতানী আমল পর্যন্ত তা কম-বেশি বজায় ছিল। এবং আজও আছে।

ইকবাল বলতে চেয়েছেন— জার্মান দার্শনিক নীটশে যেমন মনে করতেন—জাতির সমৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধির মূলে আছে Aristocracy of Supermen-দের ভূমিকা। বিত্তশালী ও সম্ভ্রান্তশালী ব্যতিরেকে সাধারণ মানুষের কোনো ভূমিকা থাকতে পারে না। কিন্তু ইসলামী দর্শন ও গণতন্ত্র সাধারণ মানুষকে নিয়েই সংরচিত হয়েছে। এখানে আরব-অনারব, সাদা-কালো, সাধারণ-অসাধারণের কোনো প্রশ্ন নেই। প্রশ্ন হচ্ছে ব্যক্তিত্ব নিয়ে, যোগ্যতা নিয়ে। সেই ততোধিক যোগ্য বলে বিবেচিত হবে যে যত ধর্ম-ভীরু, ন্যায়-নিষ্ঠ, নীতি-নিষ্ঠ।

ইসলামের ইতিহাসে সে নজির আছে। হজরত বেলাল, হজরত জায়েদ, হজরত ওসামা, সালমান ফারসী (রা.) প্রমুখ ছিলেন ক্রীতদাস কিন্তু তাঁরা অত্যন্ত সম্মানীয় স্থানে প্রতিষ্ঠিত। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সিপাহসালার রূপে মনোনীত হয়েছিলেন। এবং তাঁদের অধীনে যুদ্ধ করেছেন হজরত আবুবকর, হজরত ওমর ফারুক (রা.) প্রমুখ দোর্দণ্ড প্রতাপশালী খলিফারা।

ইকবাল এক বক্তৃতায় তাই বলেছিলেন— 'ইসলামের গণতন্ত্র অর্থনৈতিক অবস্থার চাপে বা আর্থিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার তাগিদে সৃষ্টি হয়নি। সুতরাং এই গণতন্ত্র

pdf By Syed Mostafa Sakib

একটি আধ্যাত্মিক নীতিকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এই গণতন্ত্রের নীতি হল— প্রত্যেক ব্যক্তিই কিছু না কিছু শক্তির অধিকারী এবং সাধনার বলে এই শক্তির জাগরণও বৃদ্ধি সম্ভব। তুচ্ছ উপকরণ দিয়েই ইসলাম উন্নত স্তরের মানুষ গড়ে তুলেছে।'

মদিনা সনদে সর্বপ্রথম বিশ্ব-মানবের মর্যাদা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। খ্রিস্টানরা ইহুদিদের প্রতি যে ব্যবহার করেছে মুসলিম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মুসলিমরা তার চেয়ে বহু ভালো ব্যবহার করেছে। অনুরূপ খ্রিস্টানদের প্রতিও সুব্যবহারের ইতিহাস ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করেছেন। যেমন— ফারস এর খ্রিস্টান বিশপ মারত্-এর খ্রিস্টান পাদরি এক পত্রে লেখেন— 'আরবের মুসলমানগণ, যারা আমাদের রাজ্যের অধিকারী হয়েছে, আমাদের ধর্মে হস্তক্ষেপ করে না, তারা আমাদের তাপস ও ধর্ম-যাজকদের সম্মান করে এবং আমাদের গির্জা ও ভজনালয়ের সাহায্যার্থে অর্থদান করে।'

ইংলন্ডের রাজা রিচার্ডের সময় জেরুজালেম অধিকারকালে তাঁরা মুসলমানদের উপর কীরূপ ব্যবহার করেন আর সালাউদ্দিন ও তৎপূর্বে হজরত ওমর (রা.) জেরুজালেম অধিকারের সময় কী উদারতা দেখিয়েছিলেন স্পেনেই বা মুসলিমরা সভ্যতা গড়ার বিনিময়ে প্রতিদানে কী পেয়েছিল ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্য-সচেতন ইকবাল তা জানতেন।

তাই ভুয়ো প্রতিষ্ঠান লিগ অব নেশনসকে রবীন্দ্রনাথ যেমন লিগ অব রবার্স বলেছিলেন এবং বার্নাড শ তাকে সমর্থন করেছিলেন, অনুরূপ ইকবালও নীতিবিদ হিসাবে বলতে দ্বিধা করেননি—'পূর্বে কখনো শুনিনি যে, কয়েকজন কাফন চোর কবর ভাগ করে নেওয়ার জন্য একটি সমিতি গড়বে।'

তিনি অনুধাবন করেছেন পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রাচ্যের চেয়ে এগিয়ে গেছে বহুদূর। কিন্তু অতৃপ্ত ভোগাকাঙ্খার জন্য মানুষের তৃপ্তি নেই। শান্তি নেই। স্বস্তি নেই। এক শ্রেণির মানুষের বোবা-কান্নার আর্তনাদ তাদের কাছে পৌঁছেনি। আধ্যাত্মিক উন্নতির চাবিকাঠি তারা হারিয়ে ফেলেছে। মানবিক চেতনার কণ্ঠস্বর তাদের বধির কর্ণে প্রবেশ করতে পারেনি। জাগতিক চাওয়া-পাওয়া তাদের আত্মোন্নতির পথে চিনের প্রাচীর হয়ে উঠেছে। আর প্রাচ্যের সম্পর্কে বলেছেন The condition of things in the East is no better. তৎসত্ত্বেও তিনি মনে করেন—

> আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ফকির সত্বর তার দিন ফিরে পাবে কিন্তু স্বর্ণ-রৌপ্যের ক্ষুধা প্রতীচ্যের আত্মাকে নষ্ট করে ফেলেছে।

পাশ্চাত্যের সংখ্যাতাত্ত্বিক জনগণতান্ত্রিকতায় তিনি বিশ্বাস করেননি। ব্যষ্টি নিয়েই তো সমষ্টি। তাই সমষ্টি উন্নয়নে ব্যক্তিকেও হতে হবে সৎ ও মহৎ। তাই বলেন—

একজন মানুষের মাথায় যে বুদ্ধি থাকে—তা দুশো গাধার মাথায় নেই।

তাঁর কাম্য ছিল সেই গণতন্ত্র—যেখানে ক্ষুধা-দারিদ্র্য-মজলুম থাকবে না। যেমন ওমর (রা.) বলেছিলেন—একটি ছাগল কিংবা যদি একটি কুকুর অভুক্ত থাকে তাহলে আমাকে তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে। একজন খ্রিস্টান ভিখারীকে ভিক্ষা করতে দেখে—তার জন্য সরকারি ভাণ্ডার থেকে ব্যবস্থা করে তার ভিক্ষাবৃত্তির নিরসন করেছিলেন চিরতরে।

তাই কবির কণ্ঠস্বরেও আমরা শুনতে পাই—

> ওঠো আমার দুনিয়ার গরীবদের জাগিয়ে দাও
> ধনীর প্রাসাদের দরজা-দেওয়াল নাড়িয়ে দাও।
> যে মাঠ থেকে কৃষকের জীবিকার সংস্থান হয় না
> সেই মাঠের প্রতিটি শস্য জ্বালিয়ে দাও।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদেও তিনি সন্তুষ্ট হতে পারেননি। কারণ তাতে জঠরের জ্বালা নিবারণের সুন্দর নীতি আছে কিন্তু খোদাকে পাওয়ার দরজা নেই। যা মানুষের ও মনুষ্যত্বের আসল লক্ষ্য। মাথাকে বাদ দিয়ে ধড়ের কল্পনা তাই অবান্তর। অপূর্ণ।

তাই কবি বলেন—

> তোমার জাতিকে পাশ্চাত্যের অধিবাসীদের
> আদর্শের মাপকাঠিতে বিচার করো না,
> হাশেমী বংশের রসুলের জাতি, মত ও পথের দিক
> থেকে বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

তিনি বলেন—

> আল্লাহ্‌র বান্দা সব শ্রেণি-সম্প্রদায়ের উর্ধে
> সে নিজে কারো প্রভু নয়, অন্যের সে দাসও নয়।

নজরুলও একই কথা বলেছেন—

> অন্যেরে দাস করিতে কিম্বা নিজে দাস হতে ওরে
> আসেনিকো ধরায় ইসলাম তোরা ভুলিলি কেমন করে?

আধা-জাহানের অধিকারী হয়েও মুসলিমরা ফকিরের বেশেই রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। ইতিহাস তার জ্বলন্ত সাক্ষী। তাই নাগিনীদের বিষাক্ত নিঃশ্বাস যেখানে মানুষের পৃথিবীকে বসবাসের অযোগ্য করে তোলে, ভীতির সাহারা গোবি করে তোলে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধুয়া তুলে কসাই ও ঘাতক-জল্লাদের ভূমিকা পালন করে তা কখনো

pdf By Syed Mostafa Sakib

শান্তি আনয়ন করতে পারে না।

কবি তাই সতর্ক করে দিতে চান—

হে প্রতীচ্যের অধিবাসীগণ,
খোদার রাজ্য তোমাদের দোকানদারী নয়!

ইকবাল চেয়েছিলেন হজরতের (সা.) আদর্শে বিশ্ব-রাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিকতাকে প্রতিষ্ঠা করতে। বিভিন্ন নদ-নদীর চূড়ান্ত মিলনকেন্দ্র যেমন সমুদ্র তেমনি বিভিন্নজাতির মিলনক্ষেত্র ইসলাম। ঐতিহাসিক হিট্টিও স্বীকার করেছেন— This was the first attempt in the history of Arabia at a social organization with religion rather than blood at its baris. অর্থাৎ 'মহানবীর জীবদ্দশায় ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে যে সমাজ-ব্যবস্থা আরবে কায়েম হয়েছিল, তা ছিল আরবের ইতিহাসে প্রচলিত রক্ত-ভিত্তিক সমাজের পরিবর্তে প্রথম ধর্ম-ভিত্তিক সমাজ।'

ইকবাল এ কারণে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদে, আঞ্চলিকতাবাদে, বিচ্ছিন্নতাবাদে, সাম্প্রদায়িকতাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি তাই বলেছেন—'ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদের বিষময় ফল হল তার সংকীর্ণ জাতীয়তা, যা ইউরোপের শিল্প-সাহিত্যে মানবতার মহান অনুভূতিকে পর্যন্ত খর্ব করেছে। কিন্তু ইসলাম এ শিক্ষা মানুষকে দেয়নি। মুসলমানদের মানবতাবোধ শুধু দর্শনতত্ত্বও নয়, বা নিছক কল্পনা-বিলাসও নয়, বরং মুসলমানের সামাজিক জীবনে এই মহান মানবতাবোধকে জীবন্ত, প্রাণবন্ত ও সক্রিয় করে তোলার প্রেরণা দিয়েছে ইসলাম। যার ফলে এই অনুভূতি ক্রমান্বয়ে মহত্তর রূপ লাভ করেছে।'

ইকবাল তাই ইসলামী সাম্যবাদে বিশ্বাসী। তিনি বলেন—

বর্ণ ও রক্তের পুতুলগুলো ভেঙে ফেলে মিল্লাতের মধ্যে হারিয়ে যাও
যাতে তুরানী, ইরানী, আফগানী বলে কিছু না থাকে।

তিনি বিপ্লবী হয়ে কভু ঘোষণা করেন—

তোমার ভাষা, বর্ণ ও গোত্রের ধুলিতে সমাচ্ছন্ন,
হে পবিত্র পাখি, ঊর্ধে উঠার আগে ওই ডানা থেকে মুক্ত হও!

ইকবাল তাই ক্ষুদ্র জাতীয়তাবাদী নন তিনি আন্তর্জাতিকতাবাদে বিশ্বাসী বিশ্বকবি। তাই তাঁর ভাষ্য—

খোদা-পাগল দরবেশ—না প্রাচ্যের না প্রতীচ্যের
আমার দেশ না ইসফাহান, না দিল্লি, না সমরকন্দ!

তিনি বলেন—

চিন ও আরব হামারা, হিন্দুস্তাঁ হামরা
মুসলিম হ্যাঁয় হম, ওয়াতান হ্যায় সারাজাঁহা হামারা।।

ইকবাল এই বিশ্বজনীন সৌভ্রাতৃত্ব, মিলনবাদে বিশ্বাসী ছিলেন বলেই তিনি সারাজাহানের কবি বলে স্বীকৃত হয়েছেন।

দেশকে তিনি ভালোবাসেন কারণ তিনি ছিলেন দেশপ্রেমিক। তবু সত্য-শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ায় নবিজী আল্লাহর হুকুমে দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছিলেন। তাই বলেন—

দেশত্যাগ আল্লাহ্‌র বন্ধু নবির সুন্নাত
নবুওতের সত্যতার উপর তুমিও সাক্ষ্য দাও!

তিনি তাই বলেন—

যদি আঞ্চলিকতার কারাগারে আবদ্ধ থাকো,
তবে পরিণাম তোমার ধ্বংস
মাছের মতো সমুদ্রে থাকো, মুক্ত হও সব
আঞ্চলিকতা থেকে।

তাই দেশ-প্রিয় কবি বলেন—

আজও তার জন্য আমার হৃদয়ে রক্ত ঝরে
তার স্মৃতিই আমার প্রাণবায়ু স্বরূপ।

১৯৩০ সালে লিগের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন— মানুষের বা রাষ্ট্রের রূপায়ণে ধর্মের প্রভাবই সবচেয়ে বেশি কার্যকরী এবং সবার উপরে ইসলাম নিজেই একটা নিয়তি। নিয়তির বিপর্যয় ইসলাম কখনো সহ্য করবে না।

তোমাদের অন্তর হিন্দ বা তুর্ক বা শামের মধ্যে আবদ্ধ নয়,
ইসলাম ব্যতীত অন্য কোথাও তার জন্মভূমি নেই।
তুমি মুসলিম, কোন দেশেই তোমার মনকে বেঁধে ফেলো না।

আমাদের নবি জন্মভূমি থেকেই হিজরত করেছিলেন, তাঁর অন্তর্দৃষ্টি এক নিখিল বিশ্বময় মিল্লাত সৃষ্টি করলো। এই 'দীনের' সুলতানের অনুগ্রহে—

সারাবিশ্ব আমাদের মসজিদে পরিণত হয়ে গেল।
এক কলেমার ভিত্তিতেই তা সুপ্রতিষ্ঠিত হলো।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আল্লামা ইকবাল ও ইসলামি দর্শন

আল্লামা ইকবাল শুধু কবি নন যুগের মুজাদ্দিদের কাজ করেছেন। গ্রিক, রোমান এবং পার্শিয়ান সভ্যতার পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য সভ্যতা ইসলামের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারাকে ছিনতাই করে জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শনের ছাঁচে পশ্চিমী সভ্যতা মানুষের চোখকে ধাঁধিয়ে দেয়। ইসলামের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে ইসলামী সভ্যতা ও কৃষ্টিকেই ধ্বংস করতে এগিয়ে আসে। সাংস্কৃতিক এই সংকট মুহূর্তে ইকবাল মুসলিম-বিশ্বে ত্রাতার ভূমিকা পালন করেন। পাশ্চাত্য-সভ্যতার ঢেউ উপমহাদেশেও আছড়ে পড়ে। ফলে মুসলিমের দিশেহারা অবস্থায় তিনি শক্ত হাতে হাল ধরেন। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় যুগের কাণ্ডারী হয়ে সতর্ক সাইরেন বাজিয়ে বলেন—

মুস্তফার কাছে পৌঁছে দাও নিজেকে
তিনি হলেন দ্বীনের প্রতীক
যদি ব্যর্থ হও, না পারো পৌঁছাতে
সবই যেন আবুলাহাবী। (আরওমানে হিজাজ)

ইউরোপের বস্তুবাদী জড়-উপাসক নাস্তিক্যবাদী ধর্মহীন সভ্যতার আগ্রাসনে উৎকণ্ঠিত হয়ে কবি বলেন—

আমার ভাবনা উচ্চাকাশের ভাবনা ছিল
চাঁদের পিঠে ও তারকারাজির কোলে যেমন ভেবো না,
এই মাটির পৃথিবীই আমার আবাস
কারণ প্রতিটি তারকাই একদা পৃথিবী কিংবা পৃথিবী ছিল।
(জবুরে আজম)

নজরুল ইসলাম যেমন তাঁর বিচারকের সামনে জবরদস্ত জবানবন্দী দিয়েছিলেন— মহাকবি ইকবালও মুসোলিনির সামনে তেমনি রাজনৈতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে নির্ভিক জবানে বলেছিলেন— শহরের লোকসংখ্যা যত বাড়তে থাকে, তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকটও তত বাড়তে থাকে। তার সাংস্কৃতিক শক্তির শূন্যস্থানগুলো জনশক্তি দখল করে নেয়। এটা আমার নিজস্ব দর্শন নয়, বরং আমার প্রিয় নবি (সা.) আজ

থেকে তেরশো বছর আগেই এই কল্যাণমূলক উপদেশ দিয়েছিলেন। মিশরের আধ্যাত্মিক নেতা সৈয়দ আবুল আজাম ইকবালকে বলেছিলেন— যখন মুসলমানের সংখ্যা মাত্র কয়েক লক্ষ ছিল তখনই পৃথিবীর বড় বড় সাম্রাজ্য তাদের অধীনতা মেনে নিয়েছিল। আজ চল্লিশ কোটি (বর্তমানে প্রায় দেড়শো কোটি) মুসলিম হওয়া সত্ত্বেও মুশরিকরা এখন প্রভুত্ব করছে। এর কারণ মুসলমানরা এখন ইসলাম ত্যাগ করেছে। এবং ইসলামের রুহ থেকে তারা সরে পড়েছে।

আল্লামা ইকবাল এই ইসলামের রুহকেই ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেছেন তাঁর জীবনব্যাপী কাব্য সাধনায়। তাঁর 'পায়ামে মাশরিক' বা প্রাচ্যের পয়গাম রচিত হয়েছে জার্মান কবি গ্যেটের 'দেওয়ানে'র উত্তর হিসেবে। কারণ গ্যেটে তাঁর রচনাকে মনে করেছেন প্রাচ্যের প্রতি 'উপঢৌকন'-রূপে। ইকবাল পাশ্চাত্যের মনীষীবৃন্দের প্রতি বলতে চেয়েছেন—

'পাশ্চাত্যদেশের বাসিন্দাগণ! খোদার বস্তি দোকান নয়,
তোমরা যাকে খাঁটি ভাবছ তা আসলে সস্তায় বেচা-কেনা
অচিরেই তোমাদের সংস্কৃতি নিজ খঞ্জর দিয়ে নিজেই করবে আত্মহনন।
কেননা দুর্বল বৃক্ষশাখে রচিত নীড় কখনো দীর্ঘস্থায়ী হয় না!

ইসলামের ছাঁচে ফেলে পাশ্চাত্যদর্শনকে কবি দু'নয়ন মেলে দেখেছিলেন। তাই সত্য কথা বলতে দ্বিধান্বিত হননি।

ধর্মহীন ভালোবাসার ধারায় আজ মৃত পশ্চিম
প্রাচ্যে শৃঙ্খলাবদ্ধ রয়েছে জ্ঞান অনৈক্য ও অবহেলায়।

তাঁর আসরারে খুদী তথা খুদী-দর্শন ঘিরেই গড়ে উঠেছে তাঁর কাব্যভুবন ও জীবন-দর্শন। এক সংবর্ধনা সভায় তিনি বলেন— ১৯০৫ সালে আমি যখন ইংলন্ডে আসি, আমার মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয় যে, প্রাচ্যের সাহিত্য-সম্ভার বাহ্যিক সৌন্দর্য ও চিত্তাকর্ষক হওয়া সত্ত্বেও ওই প্রাণ থাকে শূন্য, যা মানুষের জন্য আশা ও কর্ম-প্রেরণার বাণী বহন করতে পারে না। ১৯০৮ সালে যখন ইংলণ্ড থেকে প্রত্যাবর্তন করি, আমার কাছে ইউরোপীয় সাহিত্যের অবস্থাও প্রায়-অনুরূপ প্রতীয়মান হয়।

১৯১০ সালে আমার নতুন ভাবধারাকে সামনে রেখে তাই 'আসরারে খুদী' রচনা আরম্ভ করি। অতঃপর খুদী প্রসঙ্গে বলেন— যখন থেকে পাশ্চাত্যে অর্থনৈতিক বিপ্লব আসে, শিল্পায়ন ও শিল্প ব্যবস্থাপনা প্রত্যেক মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে অনেক হেয় এবং অসহায় করে তোলে। এই অবস্থার উপর চিন্তা-ভাবনা করে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, আধুনিক যুগের মানুষের জন্য এমন এক প্রতিকারের আবশ্যক রয়েছে,

pdf By Syed Mostafa Sakib

যা হতাশা এবং হীনতাভাব দূর করে তার শরীরে জীবনে নতুন স্পন্দন জাগিয়ে তোলে এবং তার পা দৃঢ় প্রত্যয় ও আত্মবিশ্বাসের শক্ত মাটিতে স্থির হয়। অতঃপর ওই রহস্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হই যে, তাকে এতকিছু মূল্যবান বস্তু দেওয়া হয়েছে— যা চন্দ্র-সূর্যকেও দেওয়া হয়নি। অর্থাৎ তা হল বিবেক এবং ব্যক্তিত্ব। আত্মাবিশিষ্ট এবং বিবেকসম্পন্ন হওয়ার দরুন মানুষের কর্তব্য হচ্ছে এই বিশ্বকে স্বীয় চিন্তা ও কর্ম দিয়ে আবাদ করা।

কবি তাই বলেন—

কেউ মানে না বস্তুর ভালো-মন্দ কী
সৎ ও অসৎ পথ কোনটি
শরীয়ত উত্থিত হয় জীবনের গভীরতা থেকে
তার আলোতেই আলোকিত হয় বিশ্বের অন্ধকার!

পাশ্চাত্যে ইকবালকে যা সবচেয়ে বেশি পীড়িত করেছিল তা হচ্ছে তাদের রাষ্ট্র ও গির্জায় তথা রাজনীতি ও ধর্মের মধ্যে বিভাজননীতি। তাঁর মতে— 'রাজনীতি ও নেতিক আচার-অনুষ্ঠান, অন্যকথায় রাষ্ট্র এবং ধর্মের মাঝে পার্থক্য ও সম্পর্কহীনতা নতুন পাশ্চাত্য সভ্যতা ও কৃষ্টিকে আত্মাহীন বানিয়েছে।'

তিনি তাই বলেন—

ঐ পুরোনো বাদ্যই পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র
যার পর্দায় শাহীগীত বিনা আর কিছু নেই
স্বৈরাচারী দানব যেন গণতন্ত্রের নর্তকী
ভেবেছ এটাই আমার স্বাধীনতার নীলমপরী!

অন্যত্র বলেন—

তুমি কি দেখনি পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র
চেহারায় কেমন উজ্জ্বল জৌলুস
অন্তরে চেঙ্গিসখানের অন্ধকার!

তাঁর মতে—

যে মুহূর্তে ধর্ম ও রাষ্ট্র ভাগ হয়ে গেল
স্বেচ্ছাচারিতার আমীরী ও উজিরীতে দেশ ভেসে গেল
আসলে দ্বৈতনীতি দেশ ও ধর্মের জন্য ব্যর্থতা বয়ে আনে
দ্বৈতনীতি সভ্যতার চোখে এঁটে দেয়
দৃষ্টিহীনতার ঠুলি।

ইকবালের মতে—

মানুষের সম্মান নিহিত মনুষ্যত্ববোধে
সুবিদিত হও মানুষের গন্তব্য সম্পর্কে।

অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী নশ্বর জীবনের জন্য মানুষের ঘোড়দৌড় শুরু হয়ে গেছে বিশ্ব অলিম্পিকে সোনা জেতার ন্যায়। অথচ চিরকালীন জগত থেকে যাচ্ছে মরুময়। রত্ন-বেনেরা রত্ন নিয়ে দরদাম কষে কিন্তু রত্নাকরের খবর সে জানে না। আসল মনি ফেলে রঙিন কাচের জৌলুসেই এরা মত্ত অধীর। ইকবাল তাই পথের দিশারী হয়ে, ভোরের মুয়াজ্জিন তন্দ্রাচ্ছন্ন অলসাতুর। মুসলমানের জন্য ঘুম-পাড়ানিয়া গান না গেয়ে ঘুম-ভাঙানিয়া গান গেয়ে জাগরণের আহ্বান জানালেন।

মত্ত হেলালের ন্যায় মঞ্জিলের দিকে ধাবিত হও
এই নীল গগনের মাঝে প্রতিনিয়ত বেড়ে ওঠো,
শেষ ঠিকানায় মর্যাদা চাও যদি এই পৃথিবীতে
অন্তরে সত্যকে ধারণ কর এবং চলো মোস্তফার পথে। (হুজুজে মিল্লাত)

১৯৩৩ সালে আফগানিস্তানের রয়্যাল আকাদেমিতে প্রদত্ত ভাষণে তিনি বলেন—

'আমার বিশ্বাস, আর্ট অর্থাৎ সাহিত্যকর্ম, কাব্যচর্চা, চিত্রকথা, সঙ্গীত, স্থাপত্যশিল্প প্রত্যেকটিই জীবনের জন্য সহায়ক এবং সেবক। এই ভিত্তিতে আমি আর্টকে শুধু বিনোদনের বাহন না ভেবে সৃষ্টিকর্ম ও উদ্ভাবন হিসাবে বিবেচনা করি। কবিরা জাতির জীবনকে আবাদ করতে পারেন, আবার বরবাদও করতে পারেন। কবিদের উচিত নতুন জাতির সত্যিকার পথ-প্রদর্শক হিসাবে কাজ করা।'

ব্যক্তিগতভাবে নজরুলের মতো তিনিও সারা জীবন এই কাজই করে গেছেন। ১৯১৯ সালে মাওলানা সৈয়দ সোলায়মান নদভীকে এক পত্রে লেখেন—

'কাব্য সাহিত্যকে সাহিত্য হিসেবে গণ্য করা কখনো আমার উদ্দেশ্য ছিল না। কেননা শিল্পের সূক্ষ্মতার প্রতি মনোযোগ দেওয়ার জন্য আমার হাতে যথেষ্ট সময় নেই। লক্ষ্য শুধু এই যে, ভাবধারায় বিপ্লব আসুক এবং তাই যথেষ্ট। —এই লক্ষ্য প্রকাশ করার চেষ্টা করি।'

এই বিপ্লবী মানসিকতা থেকেই তিনি 'পায়ামে মাশরিকে'র ভূমিকায় লিখেছেন—

'প্রাচ্য, বিশেষ করে মুসলিম প্রাচ্য শতশত বছর যাবৎ ঘোর নিদ্রার পর চোখ খুলেছে। কিন্তু প্রাচ্যের জাতিগুলির অনুধাবন করা উচিত যে, জীবন কোনোদিন তার পারিপার্শ্বিক অবস্থায় বিপ্লব সৃষ্টি করতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না তার অন্তরের গভীরে বিপ্লব সূচিত হয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

'নিশ্চয় আল্লাহ্তায়ালা কোনো সম্প্রদায়ের অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন সাধন করে (১৩:১১)। কোরানের এই অকাট্য উক্তি ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত উভয় প্রকারের জীবনের উপরই প্রযোজ্য। আমি আমার ফারসি কাব্যগ্রন্থগুলোতে এই সত্যকে পেশ করার চেষ্টা করেছি।'

এই মর্মে তিনি বলেন—

প্রাচ্যের সুরার দোকানে এখনো পাওয়া যায় ওই সুরা,
যা বিবেক আলোকিত করতে পারে।
দৃষ্টিবান লোকেরা ইউরোপ থেকে হয়েছে নিরাশ
এ জাতি সমূহের অন্তর নয় পরিস্কার।

রুমীর 'মর্দে মোমিন'-এর মতো ইকবাল ছিলেন 'ইনসানে কামিলে'র প্রবক্তা। এ হচ্ছে এমন এক মতবাদ যা আধ্যাত্মিক ও নৈতিক বলে বলীয়ান হয়ে সমগ্র বিশ্বে এক আল্লাহ্র শাসন কায়েম করে শান্তি আনতে সক্ষম হবে। বস্তুত ইনসানে কামিল ধর্ম ও রাজনীতির সংমিশ্রণে এমন এক ব্যক্তিত্ব—যার শাসনব্যবস্থায় সমাজজীবনে ধর্ম ও রাজনীতি একাকার হবে। কোনো দ্বৈতনীতি থাকবে না।

পানিও রয়েছে আয়ত্তাধীন বায়ুও আয়ত্তাধীন
কি হবে যদি পুরোনো আকাশের দৃষ্টি বদলে যায়
দেখেছে ফিরিঙ্গিদের সাম্রাজ্যবাদ যে স্বপ্ন
এটাও সম্ভব সে স্বপ্নের ব্যাখ্যা বদলে যায়
হয়তো বা পৃথিবীর ভাগ্য বদলে যায়
তেহরান যদি হয় পূর্ণ বিপ্লবের জেনেভা।

১৯৩১ সালে প্রদত্ত ইসলামী সম্মেলনের এক ভাষণে তিনি তাঁর উপলব্ধির কথা বলেন— ইসলাম এই মুহূর্তে দু'দিক থেকে হুমকির সম্মুখীন। একটি বস্তুবাদী নাস্তিকতার দিক, অপরটি স্বদেশি জাতীয়তাবাদের দিক থেকে। তাই তিনি ইনসানে কামিলের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য অর্জনের তাগিদ অনুভব করেন এবং প্রয়োগ ও প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেন। তিনি মনে করেন আনুগত্য একমাত্র আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের।

তাঁর 'দোয়া'র দু'পংক্তি হল—

মাটির দেহটিকে মোর দাউদ গীতির
নূর দ্বারা আলোকিত করে দাও,
প্রতিটি কণাকে মোর স্ফুলিঙ্গের ন্যায়
পালক ও ডানা লাগিয়ে দাও।'

ইকবাল ও রুমী

কবি ইকবাল পারস্যের সুফী কবি জালালুদ্দিন রুমীকে সর্বাধিক শ্রদ্ধার স্থানে স্থাপন করেছেন। যদিও তাঁদের অবস্থান কয়েকশত বৎসরের ব্যবধান। এ থেকে বোঝা যায় কবি ও কবিতার মৃত্যু হয় না। যদি তা সত্য-ধৃত হয়।

উভয় কবিই প্রেম বা ইশ্ক্কে বুদ্ধির উপরে স্থান দিয়েছেন। উভয়েই কর্মবাদে এবং ধর্মবাদে বিশ্বাসী। তাঁদের কাব্য-দর্শনের মূলসুর মানবমুখিনতা। উভয়েই মিস্টিসিজ্মেও বিশ্বাসী ছিলেন।

ইকবাল বলেছেন—

রুমীর প্রতিভা-দীপ্তি উদ্দীপিত করেছে আমারে
রহস্যের গ্রন্থ থেকে আজ আমি গেয়ে যাই গান।
আত্মা তাঁর অগ্নি-কুণ্ড জ্বলন্ত উজ্জ্বল।
আমি শুধু অগ্নিকণা প্রাণ পাই মুহূর্তের তরে।
পতঙ্গের মত মোরে গ্রাস করিয়াছে তাঁর দীপ্ত অগ্নিশিখা,
আমার পেয়ালা পূর্ণ করিয়াছে কানায় কানায়
স্বর্ণ মহিমায় মোর মৃত্তিকারে ফেরায়েছে রুমী
প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড করেছে সে মোরে বিভূতিরে।
দীওয়ানা মাতাল আমি মত্ত তাঁর সুরের সুরায়
জীবন-সঞ্চয় করি তাঁর বাণী মূলে।

(ফররুখ আহমদ অনুদিত)

ইকবাল তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'জাভিদনামা' রুমীর মসনবীছন্দে রচনা করেছেন।

রুমী তাঁর দীওয়ানে মসনভিতে ইশ্ক বা প্রেমকেই সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। এই প্রেম নিষ্কাম সাধকের। সে শুধু পরম প্রিয়তম আল্লাহ্কে চায়, যেমন মজনু চেয়েছিল শুধু লায়লীকে। মানবীয় প্রেমই ঐশী প্রেমের সোপান। তাই রুমী বলেন— 'মজনু হও তবে বুঝবে প্রেমের স্বরূপ'। মজনু কুকুরের পদচুম্বন করেছিল। কারণ সে লায়লীর

pdf By Syed Mostafa Sakib

পথ ধরে হেঁটে এসেছিল। লায়লীকে কেউ জিজ্ঞাসা করল— তুমি তো খুব সুন্দর নও, তবু মজনু তোমার জন্য পাগল কেন?' উত্তরে লায়লী বলল— 'তুমি কি বুঝবে সে কথা, তুমি তো মজনু নও।'

রুমী বলেন—

মাটির দেহ-প্রেমের বলে হল আকাশচারী
তুর পাহাড়ে জাগলো নাচন বঁধুর মোহন আনন হেরি।

এখানে মুসা নবীর সঙ্গে তুর পাহাড়ে আল্লাহ্‌র কথোপকথনের কথা বলা হয়েছে। রুমি তাই বলেন—

সুখে থাকো সৎচিন্তাদায়িনী-প্রেম
আমাদের সর্বরোগের চিকিৎসক তুমি।
আমাদের দোষ-ত্রুটির ঔষধ তুমি
আমাদের আফলাতুল ও জালিনুস তুমি।

অর্থাৎ প্রেমের সঞ্জীবন সুধা তথা সারাবন তহুবা বা আবেহায়াত পান করেই অমর জীবন লাভ করা যায়। আর এই প্রেমের তরবারি দিয়েই বিশ্বভুবন জয় করা যায়। পাওয়া যায় আল্লাহ্‌কেও।

তাই রুমি বলেছেন—

লক্ষ লক্ষ ফেরাউনের তলোয়ার
মুসার যষ্টির কাছে পরাজয় মানল।
লক্ষ লক্ষ জালিনুমের চিকিৎসা
ইসার নিঃশ্বাসের কাছে পরাজয় মানলো।
লক্ষ লক্ষ কাব্যগ্রন্থ ছিল
উম্মী নবির কালামের কাছে শরমিন্দা হল।

ইকবালও বলেন—

প্রেম জিব্‌রিলের শ্বাস, প্রেম মুস্তাফার হৃদয়
প্রেম আল্লাহ্‌র রসুল, প্রেম আল্লাহ্‌র বাণী,
আমার নশ্বর দেহ প্রেমের পরশে হয় জ্যোতিষ্মান
প্রেম নতুন তৈরি মদিরা, প্রেম শাহী পাত্র,
প্রেমের কাঠির পরশে জীবন-বীণায় উঠে ঝংকার
প্রেম জীবনের জ্যোতি, প্রেম জীবনের উত্তাপ।

অন্যত্র ইকবাল বলেন—

যখন প্রেম ও বুদ্ধি যুক্ত হয়
এক নতুন জগতের সৃষ্টি হয়।
উঠো, নতুন পৃথিবীর ভিত্তিগড়ো
বুদ্ধি ও প্রেমকে যুক্ত করে।

মর্দে মুমিন সম্পর্কে রুমী বলেন—

মর্দে মুমিন দরবেশী পোশাকের নীচে বাদশাহ
মর্দে মুমিন নিঃস্বতার মধ্যে সম্পদ।
মর্দে মুমিন বায়ু ও মাটির সঙ্গে সম্পর্কহীন
মর্দে মুমিন পানি ও আগুনের সঙ্গে সম্পর্কহীন
মর্দে মুমিন সিন্ধুর মতো সীমাহীন
মর্দে মুমিন বিনা মেঘে করে মুক্তা বর্ষণ!

ইকবালও বলেন—

তাক্‌দীরের শিকল নিজের পায়ে বেঁধো না,
এই আকাশের চাঁদোয়াতলে মুক্তির পথ আছে।
যদি বিশ্বাস না হয়—ওঠো, পা ফেলে দেখো
তোমার সম্মুখে দিগন্ত বিসারী প্রান্তর।

মানুষ আল্লাহ্‌র কাছ থেকে এসেছে আবার দুনিয়া শেষে আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে যাবে। হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশের নিগূঢ়তম রহস্যের কথাই মরমী কবি রুমী রূপকের মাধ্যমে অপূর্ব ইঙ্গিতে তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে—

শোনো শোনো বাঁশরীর মরম কথা
কেবলি সে গেয়ে চলে বিরহ-গাথা!

তাঁর ধেয়ানের দৃষ্টিতে বাঁশি তাই বাজে না কাঁদে। সে তার প্রিয়-বিরহের বেদনায় কাঁদে। প্রিয়-মিলনের আশায় আশায় সে বুকও বাঁধে। রুমীর মসনভি সম্পর্কে নিকলসন বলেন— most divinely human ever written.

অধ্যাপক আরবেরী বলেন— "Jalaluddin Rumi has long been recognised as the greatest mystical Poet of Islam, and it can well be argued that he is the supreme mystical poet of all mankind."

রুমী তাঁর জীবনে ৩৭ বছর বয়স পর্যন্ত কোনো কবিতা লেখেননি। অথচ মাত্র ১৩ বছরের মধ্যে তিনি ৪৭০০০ কবিতা সম্বলিত অমর মসনভি কাব্য হালের অবস্থায়

pdf By Syed Mostafa Sakib

লিখে যান। যাকে কোরানের নির্যাস বলা হয়। আলেম উলামারা যা ফারসি বয়াত হিসেবে বক্তৃতায় অলংকরণ রূপে ব্যবহার করেন। যে কারণে ইকবাল বলেন— নবী নয় তবু তাঁর রয়েছে কেতাব। তাঁর কবি হওয়ার ব্যাপারটাও অদ্ভুত। মাওলানা রুমী কোনিয়ার মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করছিলেন। হাদিস-কোরান-ফেকাহ ইত্যাদির গূঢ় তত্ত্ব ব্যাখ্যারত অবস্থায় ছিলেন। অকস্মাৎ পাগলের মতো এক ব্যক্তি তাঁর সান্নিধ্যে এসে বলে বসলেন— এগুলো কীসের কিতাব? এসব কী হচ্ছে?'

মাওলানা রূমী বলে ফেললেন—এসব জটিল বিষয়বস্তু, তুমি এসবের কিছুই বুঝবে না।' সহসা সেই পাগল লোকটি পুস্তকগুলো তুলে নিয়ে নিকটবর্তী পানির চৌবাচ্চায় ফেলে দেয়। রুমী ক্রুদ্ধ ও রুষ্ট হয়ে ওঠেন— চৌবাচ্চা থেকে তুলে দেখেন বইগুলো একটুও ভিজেনি। এ কাণ্ড দেখে তো রুমী হতবাক। এ কেমন করে সম্ভব হলো? পাগল জবাব দিল—'ওসব তুমি বুঝবে না, তোমার বিদ্যার বাইরে।' রুমী তৎক্ষণাৎ সেই সাধকের শিষ্যত্ব বরণ করে নিলেন। তাঁর জীবনের মোড় গেল ঘুরে। সাধনা ও সামায় মত্ত হলেন। মারেফাতের পথে তিনি হাঁটতে লাগলেন। ধ্যানমগ্নতায় নিমিজ্জত হলেন। এই তাত্ত্বিক-গুরুই হলেন শাম্‌স তবরেজ। তাঁর মৃত্যুর পর মাওলানা রুমীর হৃদয় তোলপাড় করে পাহাড়ি ঝর্ণার মতো নির্গত হতে থাকে কাব্যের স্রোত। এ নিয়েই রচিত হল Sufism বা Mysticism-এর অমর কাব্য মসনভী শরিফ।

ইকবাল তাই বলেছেন—

রুমীর প্রতিভা-দীপ্তি উদ্দীপিত করেছে আমারে
রহস্যের গ্রন্থ থেকে আজ আমি গেয়ে যাই গান।

মানবিক চেতনা ও ইশ্‌কের মধ্যেই কবি খুঁজে পেয়েছেন সান্ত্বনা—। আশাবাদী কবি বলেন—

সহস্র তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাত সত্ত্বেও এই কিশ্‌তি তীরে ভিড়বে,
সূর্যের দীপ্তিতে রাতের গাঢ় অন্ধকার কেটে যাবে।
তওহীদের গুঞ্জরণে এই বাগিচা আবার মুখরিত হবে।
প্রেম ও কর্ম-নিষ্ঠার নিবেদিত প্রাণ মুসলিমরা আবার একত্রিত হবে,
বাগিচার প্রত্যেক প্রাণী আবার ফুলের গন্ধে মাতোয়ারা হবে।

ইকবাল ও তাঁর কয়েকটি কবিতা

সমালোচকগণ স্বীকার করেন— মুসলিম দুনিয়ার সবচাইতে দুঃসাহসিক আধুনিক মন— ইকবাল। আমরা হয়তো এর সঙ্গে নজরুল ইসলামকেও জুড়তে পারি।

জিন্নাহ তাঁর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে বলেন— 'ইকবাল আর আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু বেঁচে থাকলে এই দেখে তিনি খুশি হতেন যে, তিনি যা চেয়েছিলেন ঠিক তাই আমরা করেছি।' জিন্নাহ্‌র একথার সঙ্গেও একমত হওয়া যায় না। কারণ ইকবাল চেয়েছিলেন ইসলামি শরীয়ত মোতাবেক এক স্বতন্ত্র অঞ্চল দেখতে। তাও বিচ্ছিন্নভাবে নয়। বর্তমান পাকিস্তান সে আদর্শে গঠিত নয়। ইকবাল তা দেখে খুশি হতেন এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ ইকবাল সম্পর্কে মূল্যায়ন করেছিলেন। তিনি বলেন— 'যে কবির কবিতার এমন বিশ্বজনীন মূল্য ছিল, এত সহজে তাঁকে আমরা হারাতে দিতে পারি না।' কিন্তু সত্যিই আমরা তাঁকে হারিয়ে ফেলেছি। ভারতে অন্যান্য হিন্দি কবি, উর্দু কবির আলোচনা হলেও ইকবালকে নিয়ে তেমন আলোচনা হয়নি। ১৯০৫ সালে কেম্ব্রিজে The development of Metaphysics in Persia বিষয়ে Ph.D পান।

১৯০৮ সালে লণ্ডনে আরবি অধ্যাপক নিযুক্ত হন। লাহোরে করেন ইংরেজিতে অধ্যাপনা। লাহোরেই পরচিত হন আতিয়ার বেগমের সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে হয় হৃদয় বিনিময়। তিনি কবিতা লেখেন তাঁকে নিয়ে।

চঞ্চল মনে এতদিন আমি ফিরেছি যে ফুল
অনেক ভাগ্যে মিলেছে তা আজ, শুনে যাও বুলবুল।
রক্ত আভায় ভরে যায় মুখ মধুর তোমার স্বরে
পারদের মতো হৃদয় আমার শুধু ওঠানামা করে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

'জাভিদনামা'য় তিনি বলেন—

জীবন মানেই হলো আত্মবোধ, নিজেকে সাজানো
নিজের সত্তার কাছে সত্য হতে চাওয়াই জীবন।

১৮৯২ সালে পত্নী হিসেবে গ্রহণ করেন করিমুন্নেসাকে। তাঁর সন্তান মরিয়ম আখতার।

১৯১৩ সালে বিয়ে করেন সর্দারি বেগমকে। সন্তান জাভেদ ও মুনিরা।

১৯১৯ সালে বিয়ে করেন মুখতার বেগমকে।

অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন ইকবাল। তিনি কথাপ্রসঙ্গে আতিয়ারকে বলেন—না, আমাকে উদাসীন বা ভণ্ড ভেবো না কখনো, ওটা আমার বুকে এসে লাগে।

একদা বলেন— উর্দু কবিতার পাঠকেরা কখনোই পড়েনি— এমন একটা কাঁপিয়ে দেওয়া কবিতা আমি লিখতে যাচ্ছি এবার।

তাঁর প্রতিটি কবিতাই পাঠককে নাড়িয়ে দেয়। তিনি আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে বলেন—কবি হিসাবে পরিচিত হতেও চাই না আমি, যদিও দুর্ভাগ্যবশত সেই পরিচয়েই লোকে আমাকে জানে। অনুরূপ বক্তব্য প্রকাশ করেন রবীন্দ্রনাথ, নজরুলও। তাঁরা কবিতার চেয়ে গানের ভুবনের বাসিন্দা বলেই চিহ্নিত হতে ভালোবাসতেন।

ইকবাল মনে করতেন—

শক্তি ভী শান্তি ভী ভক্তোঁকে গীতমেঁ হ্যায়
ধরতীবাসিয়োঁ কী মুক্তি প্রীত মেঁ হ্যায়!

১৯০৫ সালে ইকবালের ধ্যান-জ্ঞান ছিল— হিন্দি হ্যায় হম ওয়াতাঁ হ্যায় হিন্দোস্তাঁ হামারা। পরে হন জাতীয়তাবাদী থেকে আন্তর্জাতিকতাবাদী—

ভোলো এই নাম ডাকা সিরিয়া ইরাক প্যালেস্টাইন
বলো মুসলিম হ্যায় হম ওয়াতাঁ হ্যায় সারে জাহাঁ হমারা!

কবি শঙ্খ ঘোষ বলেন—'সংকীর্ণতার জাল থেকে বেরোবার জন্য রবীন্দ্রনাথ এগোতে চেয়েছিলেন বিকশিত এক মানবধর্মের দিকে, আর সেই একই ব্রতে ইকবাল খুঁজে ফিরছিলেন সর্বব্যাপী কোনো ইসলামের পৃথিবী।'

লেখক বলেন—রবীন্দ্রনাথ যদি নতুন সভ্যতার বিন্যাসের কথা ভাবতে গিয়ে তপোবনের ভারতবর্ষের বর্ণনা করতে পারেন, যদি পুরাণ বা উপনিষদের নানা শ্লোকে প্রশ্রয় খোঁজেন বারেবারেই, তাঁকে কি বিশেষভাবে সাম্প্রদায়িক ভাবি তখন? তবে

ইকবালই বা কেন ভাবতে পারবেন না যে কোরানের মধ্যে থেকে গেছে অনেক সমাধানসূত্র?'

ইকবালের ভাষায়—কোরান কাকে বলে? সে হলো ধনিকের মৃত্যু পরোয়ানা আর অন্নহারা যারা, সর্বহারা দাস, কোরান আশ্রয় তার। আমরা যে যেখানে সকলে একাসনে বসেই রুটি জল খাই, আমরা আদমের বংশধর যারা, সবার ধর্ম এক আল্লাই।

মহাকবি ইকবাল তাঁর পূর্বসূরী কবি আসাদুল গালিবকে কবিগুরু গ্যেটের সঙ্গে তুলনা করে বলেন—

দফন তুঝমেঁ কোয়ি ফখরে রোজগার অ্যয়সা ভী হ্যায়
তুঝসে পিন্‌হা কোয়ি মোতী আব্দার য়্যাসা ভি হ্যায়।

(হে পৃথিবী) তোমার কবরে শায়িত এমন আছে কি গর্বধন
এমন মোতি কি তোমার মাঝারে রয়েছে আর গোপন?

অন্যত্র গালিবকে স্মরণ করেছেন ইকবাল—

হায় অন ইস মামূর্‌হ মেঁ কহতে গমে উলফৎ অসদ
হম্‌নে ই এহ ই মানা কে দিল্লী মৈ রহে খায়েঙ্গে ক্যায়া?

এখানে এখন ছেয়েছে হতাশা ক্ষুধার দীর্ঘশ্বাস
কি করি, আহার, মানিলাম যদি দিল্লিতে করি বাস!

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইকবালের কয়েকটি বিখ্যাত কবিতা ও তার অনুবাদ

ইকবালের প্রথম প্রকাশিত বিখ্যাত কবিতাবলির মধ্যে 'হিমালয়' অন্যতম। সত্য গঙ্গোপাধ্যায়-কৃত তার অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হল—

❑ হিমালয় ❑

হে হিমালয় হে ভারতের রক্ষা প্রাচীর
চুমছে আকাশ ললাট তোমার ঝুঁকিয়ে শির!
তোমার মাঝে স্থবিরতার নাইকো নিশান
সাঁঝ-সকালের আবর্তনে তুমিই জওয়ান।
আলোর ঝলক মিলন তুর-এ কলীম মনে
আপাদ-শীর্ষ আলোক তুমি বিজ্ঞজনে।
একনজরে বাইরে দেখি পাহাড় তুমি
প্রাচীর হয়ে রক্ষা কর ভারতভূমি!
দিওয়ান তুমি, আকাশ তোমার পহেলা শে'র
আরাম গেহে টানছে সদা দিল্ মানবের!
বরফ শিরে সম্ভ্রমেরই পাগড়ি ধরে,
দিচ্ছে শরম নিজ মহিমায় তপন পরে।
পুরাণ-কথা তোমার গোটা গর্ব-গাঁথা,
তোমার কোলে মেঘের দলে শিবির পাতা।
তারার সনে শীর্ষ করে বার্তা অশেষ
মাটির পরে তুমি, তোমার ঊর্ধ্বে স্বদেশ।
তোমার কোলের ঝরনা উজল আয়না হেন
তাহার লাগি হাওয়ার দমক রুমাল যেন।

মেঘমালারা সওয়ার যেন হাওয়ার পরে
বিজলি যেন চাবুক তারা হস্তে ধরে।
হে হিমালয়, তুমিও কোনো যাদুর আগার
চার উপাদান লাগি ধরায় জন্ম তোমার।
হায় কি প্রবল মস্তিতে মেঘ যাচ্ছে উড়ে,
মুক্তগজের সমান মেঘ ঐ যাচ্ছে দূরে।
সুপ্রভাতে সমীর লহর আসছে চলি
বাঁচার নেশায় দুলছে সকল ফুলের কলি।
নীরব ভাষায় বলছে যেন পাতার দলে
কে পারে ফুল ছিঁড়তে হেথা হাতের বলে?
বলছে আমার নীরবতাই কথার পুঞ্জ
আবাস আমার প্রকৃতির এই নীরব কুঞ্জ।
আসছে নদী শিখর ছাড়ি গান শুনিয়ে
বেহেশ্‌ত নদীর তরঙ্গেরে লজ্জা দিয়ে।
গ্রাম-নগরে পথের ধারে ঠোকর হানে,
আয়না সমান প্রকৃতিরে দৃষ্টি দানে।
যাও বাজিয়ে দিলবাসী এই বাজনাটিরে
হে মুসাফির! দিল্ চেনে তোর আওয়াজটিরে।
রাতের প্রিয়া যখন খোলে মানের কেশে
দিল টেনে নেয় ঝর্না-ধারার শব্দ রেশে।
ভোলায় লিখন নীরবতা সাঁঝের বেলা,
বৃক্ষ শিরে চিন্তা-ছায়া করছে খেলা।
পাহাড় পরে আকাশ-রঙ-এ লাগছে কাঁপন
লাগছে ভালো গণ্ডে তোমার এই প্রসাধন।
হে হিমালয়, সেদিন কথা দাওগো বলে
পূর্বজেরা রইল যখন তোমার কোলে।
সেই সে সরল জীবন, কিবা রহস্য, যার
নকল প্রসাধনের নাহি কলঙ্কভার।
হে কল্পনা, দেখাওতো সেই সাঁঝ-বিহানে
হে কালচক্র, ধাওগো আবার পিছন পানে!

pdf By Syed Mostafa Sakib

❑ তরানায়ে হিন্দি : ভারত সংগীত ❑

সারে জহাঁসে অচ্ছা হিন্দোস্তাঁ হমারা
হম্ বুলবুলেঁ হ্যায় ইসকী এহ্ গুলসিতাঁ হমারা।
গুর্বৎমেঁ হো অগর হম্ রহ্তা হ্যায় দিল্ ওতন মেঁ
সমঝো ওহী হমেঁভী দিল হো জঁহা হমারা।
পর্বত ওহ্ সবসে উঁচা হমসায়া আস্মাঁকা
ওহ্ সন্তরী হমারা ওহ পাস্বাঁ হমারা।
গোদী মে খেলতী হ্যায় ইসকী হজারোঁ নদীয়াঁ।
গুলশন হ্যায় জিনকে দম্সে রশকে জিঁনা হমারা।
অয়ে আবরুদে গঙ্গা ওহ্ দিন হ্যায় ইয়াদ তুঝকো
উতর তেরে কিনারে জব কারোয়াঁ হমারা।
মজহব নহীঁ শিখাতা আপস মেঁ বৈর রখনা
হিন্দী হ্যায় হম্ ওতন হ্যায় হিন্দোস্তাঁ হমারা।
য়ুনানো মিশরো রোমা সব মিট গঁয়ে জহাঁসে
অবতক মগর হ্যায় বাকী নামো নিশাঁ হমারা।
কুছ বাৎ হ্যায় কে হস্তী মিটতী নহীঁ হমারী
সদিয়োঁ রহা হ্যায় দুশমন দৌরে জমা হমারা।
ইকবাল কোয়ী-মহরম আপনী নহীঁ জঁহাম্মেঁ
মালুম ক্যা কিসিকো দর্দে নিঁহা হমারা।।

বঙ্গানুবাদ

সারা দুনিয়ার সেরা দেশ এই মোদের হিন্দুস্তান
মোরা বুলবুল তার, সে মোদের কুসুমের উদ্যান।
বিদেশ বিভুঁয়ে থাক যদি কভু
প্রাণ আমাদের দেশে রয় তবু
যেথা প্রাণ জেনো আমরাও সেথা রহি গো বিদ্যমান।।
আকাশের সাথী ঐ যে ভূধর
সবাকার চেয়ে উচ্চ শিখর

সে-ই আমাদের সেনানী, মোদের রক্ষক সুমহান।।
অগনন নদী-কোলে করে খেলা
বারি সিঞ্চিত কুসুমের মেলা
কিবা তার কাছে স্বরগের বন নন্দন অতুলান।।
সেদিনের কথা পড়ে কি গো মনে
পুণ্য সলিলা গঙ্গা, যে ক্ষণে
আমি তোর নীরে প্রথম আমরা করেছি পুণ্য স্নান?
মোদের ধরম কভু নাহি কয়
শত্রু করিতে ভ্রাতৃ নিচয়,
হিন্দুস্থান জননী, আমরা সব তার সন্তান।।
আছিল মিশর আছিল য়ুনান
ছিল রোম, আজি কি আছে প্রমাণ?
জগতের বুকে দেখো আজো মোরা রহিয়াছি গরীয়ান।।
শত শতাব্দী রহিয়া আঁধার
আজো কেন দীপ জ্বলে অনিবার?
আজো কেন আছে জগতের বুকে আমাদের সন্ধান।।
ইকবাল কহে জগৎ মাঝার
বন্ধু মোদের কেহ নাহি আর
কেবা জানে আর মোদের গোপন বেদনার সন্ধান।।

❑ হিন্দোস্তানী বচ্চোঁকা কওমী গীত ❑

চিশ্তি নে জিস জমী মেঁ পয়গামে হক শুনায়া
নানকনে জিস্ চমন মেঁ ওহ্দৎকা গীত গায়া
তাতারিয়োঁনে জিসকো আপনা ওতন বনায়া
জিস্নে হেজাজীয়োঁসে দশ্তে অরব ছুড়ায়া
মেরা ওতন ওহী হ্যায় মেরা ওতন ওহী হ্যায়।
ইউনানীয়োঁকো জিসনে হয়রান কর দিয়া থা
সারে জহাঁকোঁ জিসনে ইল্মও হুনর দিয়া থা
মিট্টিকো জিস্কী হক্নে জরকা অসর দিয়া থা
তুর্কোঁকো জিস্নে দামন হীরোঁসে ভর দিয়া থা

pdf By Syed Mostafa Sakib

মেরা ওতন ওহী হ্যায় মেরা ওতন ওহী হ্যায়।
টুটে থে জো সিতারে ফারস্‌কে আসমাঁসে
ফির তাব দে কর জিস্‌নে চমকায়ে কহ্‌কশাঁ সে
ওহ্‌দৎ কী লয়ে সুনী থী দুনিয়ানে জিস মকাঁসে
মীরে আরবকো আয়ী ঠণ্ডী হওয়া জহাঁ সে
মেরা ওতন ওহী হ্যায় মেরা ওতন ওহী হ্যায়।।
বন্দে কলীম জিসকে পর্বৎ জহাঁকে সীনা
নুহ নবীকা আকর ঠহরা জহাঁ মফীনা
রফাৎ হ্যায় জিস্‌ জমীঁ কী হামে ফলক্‌ কা জীনা
জন্নত কী জিন্দেগী হ্যায় জিস্‌কী ফিজামে জীয়া
মেরা ওতন ওহী হ্যায় মেরা ওতন ওহী হ্যায়।।

❑ হিন্দুস্থানী শিশুদের জাতীয় সংগীত ❑

যেভূমি পরে চিশ্‌তী আপন শুনালো সত্য বাণী,
নানক যে বাগে গাইল আপন শুনলে—
তাতার যে দেশে আপনার দেশ বলিয়া লইল
হেজাজীর থেকে আরবের মাটি, যে দেশ লইল টানি,
সেই তো আমার আপনার দেশ, আমার জন্মভূমি।।
য়ুনানের অধিবাসীদের যাহা করেছিল হয়রান
সারা দুনিয়ায় শিখাইল যাহা দক্ষতা আর জ্ঞান,
যার সত্যেতে মৃত্তিকা পেল দৌলত সম্মান,
তুর্কী আঁচল ভরি দিল যাহা হীরক করিয়া দান,
সেই তো আমার আপনার দেশ, আমার জন্মভূমি।
ইরানী আকাশ হতে বসেছিল একদা যেসব তারা
তাপ দিয়ে তাহে আকাশ পথে যে করিল উজল-পারা,
যে ভূমির থেকে মিলনের স্বর শুনিল দুনিয়া সারা,
আরবের মীর যেথা হতে পেল শীতল বাতাস ধারা,
সেই তো আমার আপনার দেশ, আমার জন্মভূমি।
বান্দা কলীম ছিল যেথা আর সিনা পর্বত যার,
নূহ নবী তার তরণীতে আসি যেখানে পাইল পাড়,

আকাশ কুঠির সিঁড়ি অভিমুখে যে ভূমির রফতার,
যাহার আকাশে বাতাসেতে বাঁচা জিন্দগী অমরার,
সেই আমার আপনার দেশ, আমার জন্মভূমি।

❑ তরানায়ে মিল্লী : মিলন সঙ্গীত ❑

চীন ও অরব হমারা হিন্দোস্তাঁ হমারা
মুসলিম হ্যায় হম্‌ ওতন হ্যায় সারা জঁহা হমারা।
তওহীদ কী অমানৎ সীনোঁমেঁ হ্যায় হমারে
আসাঁ নহীঁ মিটানা নাম ও নিশাঁ হমারা।
দুনিয়াকে বুৎকদোঁমেঁ পহলা ওহ্‌ ঘর্‌ খুদাকা
হম উসকে পাসবাঁ হ্যায় ওহ পাসবাঁ হমারা।
ত্যাগোঁকে সায়েমেঁ হম পল কর জওরাঁ হুয়ে হ্যায়
খঞ্জর হালালকা হ্যায় কওমী নিশাঁ হমারা।
মগরেব কী ওয়াদিয়োঁমেঁ গুঞ্জী আঁজা হমারি
থমতা নহ্‌ থা কিসিসে সয়েলে রওয়াঁ হমারা।
বাতিল সে দব্‌নেওয়ালে ওয়ে আসমাঁ নহী হম্‌
সওবার কর চুকা হ্যায় তু ইম্‌তেঁহা হমারা।
ওয়ে গুলিস্তানে অন্দলুস ওহ দিন হ্যায় ইয়াদ তুঝকো
থা তেরি ডালিয়োঁমে জব আশিয়াঁ হমারা।
অয়ে মৌজে দজলহ্‌ তুভী পহ্‌চানতী হ্যায় হম্‌কো
অবতক হ্যায় তেরা দরিয়া অফ্‌সানহ্‌ খাঁ হমারা।
আয় অর্জেপাক্‌ তেরি হুরমৎ পেকট্‌ মরে হম্‌
হ্যায় খুঁ তেরী রগোঁমেঁ অবতক রওয়াঁ হমারা!
সালারে কারওয়াঁ হ্যায় মীরে হেজাজ অপনা
ইস নামসে হ্যায় বাকী আরামজাঁ হমারা।
ইকবালকা তরানাহ্‌ বাঙ্গোদরা হ্যায় গোয়া
হোতা হ্যায় জাদহ পয়মা ফির কারোয়াঁ হমারা।।

pdf By Syed Mostafa Sakib

অনুবাদ

চিন ও আরব আমাদের আর মোদের হিন্দুস্থান,
সারা দুনিয়াই মোদের স্বদেশ, আমরা মুসলমান।
মোদের সিনায় সিনায় রয়েছে তওহীদ আমানৎ
নয় নয় এত সোজা মুছে ফেলা মোদের নাম-নিশান।
দুনিয়ার যত মন্দির মাঝে খোদার প্রথম ঘর
আমরা তাহার পাসবান আর সে মোদের পাসবান।
মোদের জাতির নিশানে হের হে ঐ পাক খঞ্জর,
তরবারি ছায়ে পালিত হয়েই হয়েছি মোরা জওয়ান।
গুঞ্জিল ঐ আজাজ মোদের হেথা হোথা মগরেবে
পারেনি কেউই রুদ্ধ করিতে অগ্রগতির বান।
ওহে আশমান, বাতিলের মোরা করিনাকো পরোয়া
শতবার তুমি একথার নিজে নিয়েছ ইমতেহান।
ওহে অন্দলুস-গুলিস্তাঁ, এবে আছে কি তোমার মনে,
তব শাখে শাখে ছিল যে একদা আমাদের আশিয়ান।
দজলা-উর্মি, তুমিও ভালোই জানো তো হে আমাদের,
এখনো তোমার দরিয়া গাইছে মোদের কীর্তিমান।
দিনু প্রাণ মোরা, ওহে পাক ভূমি, তব ইজ্জৎ লাগি
এখনো তোমার রগে মম খুন রহিয়াছে চলমান।
হেজাজের মীর হয় গো সালার আমাদের কারোয়াঁয়
এ নামের মাঝে পায় গো পরাণ আরামের সন্ধান।
এই এ তরানা ইক্‌বালকৃত ভোরের এ আওয়াজ,
চলিতেছে ফের নব নব পথে আমাদের অভিযান।

গালিবের ন্যায় বাহাদুর শাহ জাফরের ঐতিহাসিক কবিতা—

নহীঁ হালে দেহলী সুনানেকে কাবিল
ইয়ে কিস্‌সহ হ্যায় রোনে রোনানেকা কাবিল।
উজারে লুটারোঁনে ওহ কসর উস্‌কে
জো যে দেখনে অওর দিখানে কা কাবিল।
নহঘর হ্যায় নহদর হ্যায় রহা ইক জফর হ্যায়
ফকৎ হালে দেহলি শুনানেকে কাবিল।।

অর্থাৎ— দিল্লির কথা নহে আর শুনাবার,
এ কাহিনি আজ কাঁদবার কাঁদাবার।
লুটেরারা তার প্রাসাদ করেছে লুট।
যা ছিল সবার দেখবার দেখাবার!
ঘর-দোর নেই জাফর মাত্র আছে
দিল্লির কথা শোনানো বাসনা যার!

এই জাফরই লিখেছিলেন—

গাজীয়োঁ মে বু রহে গী যব তক ঈমান কী
তব লণ্ডন তক চলেগী তেগ হিন্দুস্তান কী।

❑ দেবদূতগণের প্রতি খোদার নির্দেশ ❑

ওঠো যাও মোর দুনিয়ার যত গরিবে জাগিয়ে দাও
ধনীর মহলে দরোজা দেওয়ালে কাঁপন লাগিয়ে দাও।
বিশ্বাস-ব্যথা দিয়ে গোলামের রক্তেতে দাও তাপ
মানুষ রতনে উর্ধ-গগনে বাজের সনে লড়াও।
আসছে আজিকে গণতন্ত্রের সুলতানী করা কাল,
যতেক জীর্ণ আসিবে নজরে শেষ করে সবে দাও।
যে ক্ষেতের থেকে সহজে কিষাণ পাবে নাকো তার বুজি,
সে ক্ষেতের যত খোসা আর গম সকল জ্বালিয়ে দাও।
স্রষ্টা-সৃষ্টি মাঝারে কেন গো রবে এক যবনিকা?
আল্লাহ্‌র থান হতে যত পীরে সুদূরে হটিয়ে দাও।
খোদার কাছেতে এই এ সিজদা মূর্তি পরিক্রমা—
এর চেয়ে ভালো মঠে মসজিদে চিরাগ নিভিয়ে দাও।
আমি তো অখুশি রয়েছি বেজার মর্মর শিলা পরে
আমার লাগিয়া মাটি-মসজিদ আরো আরো গড়ি দাও!
নব সভ্যতা কাচ-কারখানা সে তো আছে বড় দামি।
প্রেমোন্মাদের উপায় পূবের কবিরে শিখিয়ে দাও।

pdf By Syed Mostafa Sakib

উর্দু

উঠো মেরি দুনিয়াকে গরীবোঁকো জগা দো
কাখে উম্রাকে দর ও দিওয়ার হিলা দো।
গর্মীও গুলামোঁকা লহ্ সোজে ইয়াকি সে
কুঞ্জুশকে ফরোমায়াহ্কো শাহীঁ সে লড়া দো।
সুলতানী-এ-জম্হুরকা আতা হ্যায় জমানহ্
জো নকশে কোহন তুম্কো নজর আয়ে মিটা দো।
জিস্ খেত সে দহ্কাঁ কো মায়অস্সর নহ্হো রোজী
উস্ খেতকে হর খোশহ্ এ গন্দুম তো জলা দে।
কেঁও খালিক ও মখলুক মেঁ বায়েলরহেঁ পর্দে
পীরানে কলিসা কো কলীসাসে উঠা দো।
হফ্ রা ব-সজুদে সনমাঁ বা ব-তওয়াফে
বেহ্তর হ্যায় চিরাগে হরমও দয়ের বুঝা দো।
মায়ঁ না খুশও বেজার হুঁ মর্মর কী সিলোঁসে
মেরে লিয়ে মিট্টিকা হরম্ আওর বনা দো।
তহ্জীবে লোয়ী কারগহে শীশহ গয়াঁ হ্যায়
আদাবে জুনুঁ শায়রে মশরিক কো শিখা দে।

ইকবাল ও নজরুল

ইকবাল ও নজরুল। একই দেশের একই শতাব্দীর বৃন্তে ফুটে ওঠা দুটি ফুল। একই তরুর শাখায় দুটি পাখি। গান গাইলেন ভিন্ন ভাষায়। কিন্তু একই সুরে। উর্দু আর বাংলা। যুগ-নকীব আর সুর-সৈনিক। বিদ্রোহী—প্রেমিক ও সুফী-তাত্ত্বিক। এহেন যুগন্ধর পুরুষ-পুঙ্গবদের সম্পর্কেই বুঝি বলা হয়— When heaven intendents to make mighty things, He make a poet or best a king.

ইকবাল আর নজরুল ছিলেন সমসাময়িককালের যুগ-প্রতিনিধি। আবার যুগ-প্রবর্তক কবিও। যুগের বেদনা ও কালচেতনা যেমন প্রখর হয়ে তাঁদের বুকে অনুভূত হয়েছিল, তেমনি যুগ-জয়ী কালোত্তীর্ণ সাহিত্য—মননের ছাপও তাঁদের কাব্যে সুস্পষ্ট রূপ পায়। ইতালির কবি দান্তের যেমন ভার্জিল, রবীন্দ্রনাথের যেমন বিহারীলাল, গালিবের গুরু যেমন আমির খসরু, ইকবালের তেমন রুমী। রুমী প্রসঙ্গে তিনি বলেন—

রুমীর ন্যায় দিয়েছি আজান কাবার সীমায়
তাঁর কাছে লাভ করেছি জীবন রহস্য।
তিনি ছিলেন অতীতের দুর্দিনে আর
আমি আছি বর্তমানের দুঃসময়ে।

নজরুল ইসলামও কবি-ওস্তাদ কাজি বজলে করিমের কাছে তাঁর কাব্য-ঋণ স্বীকার করেছেন। 'ভবিষ্যতের নবী' হওয়ার গৌরব-লোভী কবি না হয়ে নিজেকে বর্তমানের কবিরূপেই চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। মানবাত্মার যেখানে লাঞ্ছনা, মানবতা নিয়ে যেখানে হীন অবমাননা, নজরুল ইসলাম সেখানেই প্রতিবাদী। তিনি ফরিয়াদী কবি।

ইকবালও কবি হিসেবে দলিত পতিত অনশনক্লিষ্ট নিখিল নির্যাতিত দৈন্য-পীড়িত মানুষের ক্রন্দনধ্বনি শুনেছেন কান পেতে। যুগের তূর্য-বাদক নকীব হয়ে, ভোরের মুয়াজ্জিন হয়ে তাই মুমূর্ষু জাতির মরণ-শিয়রে দাঁড়িয়ে জীবনের তকবীর শুনিয়েছেন স্রষ্টার ফরমান নিয়ে।

ওঠো দুনিয়ার গরীব ভুখারে জাগিয়ে দাও
ধনিকের ঘরে ত্রাসের কাঁপন লাগিয়ে দাও।

pdf By Syed Mostafa Sakib

শ্রমিক মজুর পায় না মাঠের শ্রমের ফল
সে মাঠের সব শস্যে আগুন লাগিয়ে দাও।

শেলীর Song to the men of England কবিতায় এর সমভাব পরিলক্ষিত হয়।

Sow seed but let no tyren heap
Final wealth, let no imposter heap.

কবি নজরুল ইসলামের মধ্যেও একই বিদ্রোহের সুর প্রতিধ্বনিত হয়েছে—

কে খায় এ মাঠের ফসল কোন্ সে পঙ্গপাল
আনন্দের হাটে কেন তাহার হাঁড়ির হাল।
জাগে না কি শুকনো হাড়ে বজ্র-জ্বালা তোর
চোখ বুজে তুই দেখবিরে আর করবে চুরি চোর?

দার্শনিক কবি ইকবাল বুঝেছিলেন— মানুষ যতক্ষণ না অন্তরের দিক থেকে জাগবে, প্রাণের শক্তি সম্পর্কে না অবহিত হবে, 'খুদী'কে না চিনবে, ততক্ষণ নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারবে না। সজাগ সচেতন ও আত্ম-নির্ভর হয়ে উঠবে না। ভীরুতা, দীনতা, হীনতা কাটিয়ে উঠতে পারবে না। জাতিকে তিনি তাই দিলেন অমোঘমন্ত্র। জাতীয় জীবন উদ্দীপনের মহান দাওয়াই। বেলালী-কণ্ঠে তেজোদীপ্ত স্বরে শোনালেন উদাত্ত আহ্বান—

আপনারে কর এত উন্নত সব ভাগ্যের আগে
খোদ প্রভু তার বান্দারে কবে— বল্ কি বাসনা তোর?
(বালে জিব্রীল)

তিনি শোনালেন আত্মশক্তিতে জাগ্রত চঞ্চল হয়ে ওঠার গান—

নদী তরঙ্গে ঝাঁপ দাও সুখে বীর সংগ্রামী বীর্যবান
সংগ্রাম মাঝে নিহিত রয়েছে অনন্ত সুখ সুকল্যাণ।
(বালে জিব্রীল)

এই আত্মজ্ঞানের কথা বলেছেন নজরুল ইসলামও। আরো বলিষ্ঠ স্পষ্ট ও প্রত্যয়নিষ্ঠ চিত্তে—

বলবীর
বল উন্নত মম শির
শির নেহারি' আমারই নতশির
ওই শিখর হিমাদ্রীর। (বিদ্রোহী)

নজরুলের এই 'বিদ্রোহী' তো ইকবালের 'খুদী'রই ব্যাখ্যান।

কে ভগবান? আত্মজ্ঞান! এই আত্ম-জ্ঞান এত আত্ম-দর্শনের পরিচয় ফুটে উঠেছে তাঁর 'মায়া-মুকুর' কবিতায় ও অন্যত্র, নানা ভাষায়।

তুমি ছোট নহ, ঐ সে ক্ষুদ্র দেহখানি তুমি নও
নিজেরে দেখিলে দেখিবে তুমিই বিপুল বিরাট হও।

অন্যত্র আছে—

তুই খোদকে যদি চিনতে পারিস চিনবি খোদাকে
তোর রুহানী আয়নাতে দেব সেই নুরী রওশন।

এই আত্মশক্তির জাগরণের অভাবেই মানুষ হয় জীবন-যুদ্ধে পরাজিত। হয় পদে পদে লাঞ্ছিত। আত্মার গ্লানিতে হয় আকণ্ঠ নিমজ্জিত। তাই সুষুপ্ত-শক্তি-কুমারের ঘুম ভাঙাতে চাই জীয়ন-কাঠির ছোঁয়া। চাই অগ্নিমন্ত্র—

উঠো জাগো নতুন বিশ্ব গড়ো
অগ্নি-শিখায় ঝাঁপিয়ে পড়ো ইব্রাহিম হও।

ইকবাল আরো বললেন— তুমি সূর্যের চেয়ে উজ্জ্বলতর আলো নিয়ে পৃথিবীতে এসেছ। যে সূর্য সারা পৃথিবীকে আলো দেয়। এমন করে জীবন যাপন কর যাতে প্রতিটি ধুলিকণা আলোকিত হয়। অমিত শক্তিধর অমৃত-শক্তিধারী মানুষকে তাই বলেন—

নিজের শক্তি সম্পর্কে অবহিত হও
তুমি বিন্দু বটে, তবু সিন্ধুর মতো সীমাহীন।

শক্তি-অন্ধ বিশ্ব-মুসলিমের দুঃখ-ধন্ধ দেখে কবিতাই বেদনা-বিহ্বল—

তেরী দরিয়া মে তুফাঁ কেঁউ নহী হ্যায়
খুদী তেরী মুসলমাঁ কেউ নহী হ্যায়?

কবি নজরুল ইসলামও সেই উত্তাল যৌবন জল-তরঙ্গ হিল্লোলে জাতিকে জাগাতে লেখনী-মুখে আনলেন জীবনদায়িনী অমৃত সুধা সঞ্জীবনী বিশল্যকরণী, আনলেন শরাবন তহুরার আবেহায়তি—

এই আল্লার হুকুম— ধরায় নিত্য প্রবল রবে
প্রবলেই যুগে যুগে সম্ভব করেছে অসম্ভবে।

তরুণ শহীদদের উদ্দেশ্যে তিনি তাই বলেন—

সাগরে ঝাঁপায়ে পড়ো অকারণে উঠো দূর গিরি-চূড়ে
বন্ধু বলিয়া কণ্ঠে জড়াও পথে পেলে মৃত্যুরে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

শক্তি-দিশারী নজরুলের বিপ্লবী শিখা জ্বলে উঠেছে দিকে দিকে। সুপ্ত শক্তির উদ্বোধনী-গীতিতে মুখর হয়েছে ইকবাল-সাহিত্যও। বজ্র-বিদ্যুৎ ঘেরা সু-দুর্গম উচ্চতার শীর্ষে বাঁধো নীড়—এই বরাভয় মন্ত্র নজরুল কাব্যেও অনুরণিত হয়েছে বারবার—

বজ্র আলোকে মৃত্যুর সাথে হবে নব পরিচয়
জয় মানুষের জয়।

কিংবা— যে দুর্দিনের নেমেছে বাদল তাহারি বজ্র শিরে ধরি
ঝড়ের বন্ধু আঁধার-নিশীথে ভাসায়েছি মোরা ভাঙা-তরী।

নজরুল কাব্যে দারুণ রাতের তরুণ অভিযানী নওজোয়ানেরা নয়া জামানার দাওয়াত নিয়ে এইভাবে ভাঙা-কেল্লায় সবুজ নিশান উড়িয়েছে।

ইকবালের সাহিত্য-দর্শনে যেমন অতীত ও বর্তমান, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, সত্য ও শক্তি, ধর্ম ও রাজনীতির অপূর্ব সমন্বয় লক্ষ করা যায়, অনুরূপ নজরুল সাহিত্যেও। ইকবালের মতো নজরুলের সাহিত্যও নিছক সৌন্দর্য চর্চার বস্তু নয়। শৈল্পিক-বিলাস নয়। প্রয়োজনের সামগ্রী। জীবনকে উদ্দীপ্ত আশায় উদ্ভাসিত ও মানবজীবনকে কল্যাণ পথে নীত করাই সাহিত্য-দায়িত্ব। ইকবালের মতে— পৌরুষ-দীপ্ত, বলিষ্ঠ কণ্ঠ ও নীতি-কণ্ঠ লেখনীধারাই পারে জাতিকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে গঠিতে, সমুন্নত ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত করতে।

তাঁর মতে—

বে মুজেজা দুনিয়ামে উভারতী নেহী কওমে
জো-জারবে কালিমী নেহী রাখতা ওহ হুনার কিয়া।

অর্থাৎ অলৌকিক শক্তি ছাড়া জাগে না হায় জাতির প্রাণ
মুসার আসার শক্তি পেলে শিল্প দেবে পরিত্রাণ।

কবির মতে— জীবনের সম্পর্ক দৃঢ়তাতেই। দুর্বলতাই অপরিপক্কতা। তাই তিনি পুরোনো জীর্ণ পৃথিবী ভেঙে নতুন বিশ্ব গড়ার অভিলাষী।

এই জগৎ এই নক্ষত্র পুরোনো হয়ে গেছে। আমি এক নতুন পৃথিবী দেখতে চাই।

নজরুলও এই নতুন জগৎ নতুন ভবিষ্যৎ রচনার শপথব্রতী ছিলেন—

যত পুরাতন সনাতন জরাজীর্ণেরে ভাঙ ভাঙরে আজ
আমরা সৃজিব আমাদের মতো করে আমাদের নব সমাজ।'

তরুণদের সঙ্গে নিজেও তরুণ-নিশান-বর্দার হয়ে তিনি বলেছেন—

নব-নবীনের গাহিয়া গান
সজীব করিব মহা-শ্মশান

আমরা দানিব নতুন প্রাণ
বাহুতে নবীন বল।...
আমরা গড়িব নতুন করিয়া ধুলায় তাজমহল।

বীর সৈনিক নির্ভীক অগ্রপথিকের মতো ইকবাল বলেছেন—

প্রতিটি মঞ্জিলের পরে আছে তোমার আরো মঞ্জিল

কিংবা জীবন অভিযান ছাড়া আর কিছু নয়।

নজরুলের কণ্ঠেও একই অনুরণন শোনা যায়—

নতুন পথের যাত্রা পথিক চালাও অভিযান।

কিংবা মাদল বাজিছে কামানের ঐ শোনো মহা আহ্বান
জীবনের পথে চলো আর চলো অভিযান অভিযান।

'অগ্রপথিক' কবিতাতেও আছে—

অগ্রপথিক রে সেনাদল! জোর কদমে চলরে চল!

শেলী বলেছেন— Poets are trumpets which sing to battle.

ইকবালের দৃষ্টিতে The highest art is that which us to face the trials of life manfully.

নজরুল-সাহিত্য-দর্শনেও অসির সঙ্গে বাঁশির, অগ্নির সঙ্গে বীণার, প্রেমের আর প্রহারের, বেদনা-সুন্দর ও শক্তি-সুন্দরের অবস্থান পাশাপাশি। মম একহাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণ-তূর্য।

টলস্টয় বলেছেন— সেই শিল্পই মহৎ শিল্পের দবিদার যাতে আছে জনগণের প্রবেশাধিকার।

নজরুল-সাহিত্যেও এই জন-দাবি সুপ্রতিষ্ঠিত।

রবীন্দ্রনাথের মতো ইকবালও 'জীবনে জীবন যোগ করা'র কথা স্বীকার করেছেন। বলেছেন—

হৃদয়ের রক্ত বিনা সকল ছবিই প্রাণহীন
হৃদয়ের রক্ত বিনা সকল গানই প্রাণহীন।

শিল্পের জন্য শিল্প (Arts for arts sake) নয়, মানুষের জন্যই শিল্প (Arts for man's sake) এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিলেন ইকবাল। তিনি তাই বলেন—

দিল থেকে যদি উঠে কোনো বাণী প্রভাব রাখে সে সুনিশ্চয়
পাখ্ না থাকুক তবুও তাহার ঊর্ধে ওঠার তাগিদ রয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হুইটম্যানের মতো নজরুলও শুধু আনন্দ-সুন্দরের নয়, বেদন-সুন্দরেরও গান গেয়েছেন। তাঁর বাণীকে তাই শিল্পীর বাণী না বলে বলেছেন বেদনাতুরের কান্না। তাঁর চোখের জলে সকলের চোখের জল এসে মিশেছে বলেই তাঁর সাহিত্য বেদনার তীর্থ-লোকে পরিণত হয়েছে।

রুমীর যে মর্দে মুমিন, ইকবালের তেমনি ইনসানে কামেল (Perfect man) বা পরিপূর্ণ মানুষ রূপে তিনি মুসলমানকে দেখতে চেয়েছেন।

মোমেন মানুষ, কিতাব নিশানা শোনো তার পরিচয়
মরণ আসিলে হাসি মুখে তারে বরণ করিয়া লয়।

তাঁর মতে— মুসলিম হবে পরিপূর্ণ মানুষ। অসম সাহসী। সিংহের মতো শক্তিধর, কিন্তু শৃগালের শঠতা জানে না।

সায়েরে আজম নজরুলও মুসলমান বলতে এইরূপ শক্তিধরকেই বুঝিয়েছেন—

আল্লাহ্-তত্ত্ব জেনেছ কি যিনি সর্বশক্তিমান
শক্তি পেল না জীবনে যে জন নহে সে মুসলমান।
শোনো মিথ্যুক! এই দুনিয়ায় পূর্ণ যার ঈমান
শক্তিধর সে টলাইতে পারে ইঙ্গিতে আসমান।

কবিরা আশাবাদী। আশা-রঙিন কল্প-লোকের ছবি এঁকেছেন ইকবাল।

সূর্যের দীপ্তিতে রাতের আঁধার কেটে যাবে
তওহীদের গুঞ্জরণে এই বাগিচা আবার মুখরিত হবে।

নজরুলও দুর্মর আশার গান গেয়েছেন—

উদিবে সে রবি আমাদেরই খুনে রাঙিয়া পুনর্বার।

কিংবা দুঃখ কি ভাই কেনানে আবার হারানো ইসুফ আসিবে ফিরে
দলিত শুষ্ক এ মরুভূমি পুনঃ হয়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে।

ইকবাল-সাহিত্যের আরেক বৈশিষ্ট্য দেশপ্রেম। দেশ-প্রীতিকে ধর্মের অঙ্গ হিসেবে দেশ-জননীকে আত্মার আত্মীয় রূপে তিনি দেখেছেন। তাই তাঁর চোখে—

সারা জাঁহা হে অচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হমারা।
হম বুলবুলে হ্যায় ওহ্ গুলিস্তাঁ হমারা।

'হিন্দুস্তাঁ কী গীত'-এর মধ্যেও দেশ-প্রীতি জাগাতে চেয়েছেন। জাতীয়তাবাদী ইকবালের জ্বলন্ত দেশ-প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর 'জাবিদনামা' কাব্যে।

আমার কাছে হিন্দুস্তানের কথা বলো যার প্রতি ধুলিকণা আমার কাছে বুস্তানেব

চেয়েও দামী।

বলেছেন আরো—

পথর কী মুরতো মে সমঝা হ্যায় তু খুদা হ্যায়
খাকে ওতনকা মুঝকো হর হর দেওতা হ্যায়।

অর্থাৎ প্রস্তর মূর্তিতে ভাব তোমার তো প্রভু আছে
আমার স্বদেশের প্রতি ধূলিকণা দেবতা আমার কাছে।

কবিগুরুর ধূলা-মন্দিরের মতো তিনি ধুলার জগতকেই মন্দির রূপে কল্পনা করেছেন।

দেশ-প্রেমের জোয়ার বইয়েছেন কবি নজরুলও। তাঁর কাব্যে গানে প্রবন্ধে নাট্যে গল্পে উপন্যাসে সর্বত্র। জ্বালাময়ী বিপ্লব-বহ্নি ছড়ানোর অপরাধে তাঁর বহুগ্রন্থ হয়েছে নিষিদ্ধ। বাজেয়াপ্ত। দণ্ডপ্রাপ্ত এবং অবলুপ্তও। ব্যক্তি-জীবনেও তিনি কারাবরণ করেছেন দেশের জন্য। আমার সোনার হিন্দুস্তান, দেশ দেশ নন্দিতা তুমি, খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি আমার দেশের মাটি প্রভৃতি দেশবন্দনামূলক গান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ঋষি টলস্টয়ের মতো ইকবাল ছিলেন নীতি ও ধর্মের পরিপোষক। ঔপনিষদিক কবি রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও সত্য-সুন্দরের উপাসক। তাঁর মতে He (artist) is an associate of God and best to time and eternity in his Soul। তাঁর সমাজ তাই ধর্মহীন সমাজ নয়। তাঁর সৃষ্টিতে রাজনীতি থেকে ধর্ম গেলে থাকে শুধু চেঙ্গিজী। তাই ইকবাল পশ্চিমী নিরীশ্বরবাদী সাম্রাজ্যলোলুপ পশুশক্তির লেলিহান শিখার সমালোচনায় মুখর হয়েছেন। দিকে দিকে নাগিনীরা বিষাক্ত বাতাসে শান্তির ললিত বাণীকে স্তব্ধ করতে চাইছে। সেখানে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় কবি বলেছেন—

সাম্রাজ্যলোভী কুচক্রীর দলই তো
কেড়ে নেয় শরীর থেকে জীবন
আর কেউ হাত থেকে কেড়ে নেয় রুটি!

নজরুল ইসলামও একই অনুভূতি থেকে লেখেন—

তোমার:আকাশ বাতাসে কাহারা
করিয়া তুলিছে ভীতির সাহারা
যে যত ভণ্ড ধড়িবাজ আজ সেই তত বলবান
নীতি নব ছোরা গড়িয়া কসাই বলে জ্ঞান-বিজ্ঞান!

উদার মানবিকতা ও অখণ্ড সাম্যের কবি হিসেবে ইকবাল বলতে চেয়েছেন—

আল্লাহ্র বান্দা সব শ্রেণি সম্প্রদায়ের উর্ধ্বে
সে নিজেও কারো প্রভু নয়, অন্যেরও সে দাস নয়।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বলেছেন— চীন ও আরব হমারা হিন্দুস্তাঁ হমারা
মুসলিম হ্যায় হম ওতন হ্যায় সারা জাঁহা হমারা।

ইসলামের কুল্লো মুমেনুন ইখওয়ানুন—। সমগ্র মানবমণ্ডলী একজাতি। মুসলমান তাই ভাই ভাই। সবাই একই পিতার সন্তান।

রবীন্দ্রনাথের —সব দেশে মোর ঘর আছে আমি সেই দেশ নেব খুঁজিয়া'

ইকবালও বলেছেন—

মোমিন কে জাঁহা কি দেশ নহী হ্যায়
মোমিন কা মোকাম হর কহী হ্যায়।

বিশ্ব-মিলনের কবি নজরুলও বলেন—

ধর্মের পথে শহীদ যাহারা আমরা সেই যে জাতি
সাম্য-মৈত্রী এনেছি আমরা বিশ্বে করেছি জ্ঞাতি।

সাম্যের সুরে গেয়েছেন—

গাহি সাম্যের গান—
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-খ্রিস্টান।
গাহি সাম্যের গান—
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাহি, নহে কিছু মহীয়ান।

মহাকবি ইকবালও বলেছেন—

খোদা-পাগল দরবেশ না প্রাচ্যের না প্রতীচ্যের
আমার দেশ ইস্পাহান, না দিল্লি, না সমরকন্দ!

নজরুল বলেন— আমি এই দেশে এই সমাজে জন্মেছি বলেই শুধু এই দেশের বা এই আমলের নই। আমি সকল কালের সকল দেশের। বিশ্ব-প্রেমিক ইকবাল বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে কখনো বলেন— আমি মানুষ আর কোনো পরিচয় নেই, তারপর আমি হচ্ছি— হিন্দি বা তুরানী।

নজরুলও 'বাঁধনহারা' উপন্যাসে নায়িকার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন—

> সবধর্মের ভিত্তি চিরন্তন সত্যের উপর এই সত্যকে যখন মানি তখন আমাকে যে ধর্মে ইচ্ছা ফেলতে পারি না—আমি মুসলমান, আমি খ্রিস্ট, আমি বৌদ্ধ, আমি ব্রাহ্ম।'

উভয় কবিই ছিলেন অসাম্প্রদায়িক ও মানবতাবাদী এবং বিশ্ব-মানবপ্রেমিক।

চারণের বেশে জাগরণী মন্ত্রে ভীত নির্জিত জাতিকে জাগাতে চেয়েছেন বিপ্লবী তূর্য-নাদে। বিশল্যকরণী শক্তিতে। এইজন্য উভয়কেই মুসলিম রেনেসাঁর কবিও বলা হয়। রবীন্দ্রনাথ যেমন উপনিষদের ভাষ্যকার, এঁরা তেমনি ইসলামের ভাষ্যকার, সুরকার। ইসলামী শরীয়তের আদর্শে ইকবাল এক নতুন রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছিলেন। এইজন্য তাঁকে পাকিস্তানের রূপকার বলা হয় এবং সাম্প্রদায়িক বলে ভয়ানক ভুল করা হয়।

১৮৩০ সালে বন্ধু এডওয়ার্ড টমসনকে লেখা তাঁর চিঠি এবং এস. এম. এইচ বার্ণের লেখা 'ইকবাল ভারতের কবি ও দেশপ্রেমিক' শীর্ষক গ্রন্থ থেকে বোঝা যায় দেশের প্রতি ও দেশবাসীর প্রতি তাঁর প্রেম কত গভীর ও নিটোল। বার্ণের মতে— 'ইকবাল শেষজীবনে যত কবিতা লিখেছেন তাতে স্বদেশ ভারতের প্রতি তাঁর আত্মিক সংযোগের বহু নমুনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ভারতের সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় সংহতি তাঁর কাছে ছিল এক অমূল্য ঐতিহ্য। একাধিক ভাষা ও ধর্মের বিভিন্নতার মধ্যেও ভারতবর্ষের আত্মার গভীরে ঐক্যের সন্ধান পেয়েছিলেন ইকবাল। বার্ণের মতে— হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের বিভেদ দূর করার জন্য ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টাও চালিয়েছিলেন। তাঁর মতে, ভারতবাসীর শুভেচ্ছা ও ভ্রাতৃত্বের নীতির সামনে একটিই উপাস্য থাকা উচিত আর তা হল— তামাম ভারতবর্ষ তাদের সকলের স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি।'

এ থেকে প্রমাণিত হয়, রবীন্দ্রনাথ যেমন 'ভারত-তীর্থ' কবিতায় সকল সম্প্রদায়কে মিলনের রাখীতে বাঁধতে চেয়েছেন, নজরুল যেমন— 'এক বৃন্তে দুটি কুসুমে'র মিলনের গান গেয়েছেন, ইকবালও তেমনি অখণ্ড ভারতের মিলন-সুখের প্রত্যাশী ছিলেন। ভারতের খণ্ডীকরণ, ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদিতার মূলে ইংরেজ একথাও তিনি বহু পূর্বেই— নজরুলের মতো পরিস্কার ভাষায় বলে গেছেন। এ থেকে বোঝা যায়, নজরুলের মতোই তিনি ছিলেন আদর্শিক, অসাম্প্রদায়িক এবং দেশপ্রেমিক। সাম্প্রদায়িক মোটেই নন। নজরুল ইসলামও পিছিয়েপড়া জাতির জন্য ঘুম-ভাঙার গান গেয়েছেন। প্যান ইসলামিজমকে সমর্থন করেছেন, কিন্তু তিনি কি অসাম্প্রদায়িক নন? ইকবাল যদি সংকীর্ণ-চিত্ত হতেন তাহলে কখনো নতুন মন্দির, আফতাব (গায়ত্রীর মন্ত্রের অনুবাদ), স্বামী রামতীর্থ, ভৃগু, নানক, লেলিন, রাম লিখতেন না। ১৯২৫ সালে লাহোরের এক সংস্থার কাছে তিনি 'কাফের' আখ্যা পেয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন—মজহাব নহি শিখাতা বৈর আপনা অর্থাৎ ধর্ম কখনো বিরোধ শিক্ষা দেয় না। নজরুল, হাফিজ, ওমর খৈয়াম এরাও কাফের আখ্যা পান।

ইকবাল যে উদার মতাবলম্বী ছিলেন, তা তাঁর সাহিত্য ভাষণ থেকেই বোঝা যায়। তিনি বলেন— 'যদি আঞ্চলিকতার কারাগারে আবদ্ধ থাকো তবে পরিশেষে তোমার ধ্বংস। মাছের মতো সমুদ্রে থাকো, মুক্ত হও সব আঞ্চলিক থেকে।'

pdf By Syed Mostafa Sakib

এই আদর্শের অনুসারী ছিলেন নজরুলও। তাঁর মতে—'সাহিত্যিকের, কবির, লেখকের প্রাণ হইবে আকাশের মতো উন্মুক্ত, উদার। সেখানে কোনো ধর্ম-বিদ্বেষ, জাতি-বিদ্বেষ বড়-ছোট জ্ঞান থাকবে না।'

কেউ বলেন—ইকবাল আগে মুসলমান তার পর কবি। কিন্তু ইকবালই তো বলেছেন—'বর্ণ ও রঙের পুতুলগুলো ভেঙে মিল্লাতের মধ্যে হারিয়ে যাও। যেন, ইরানী, তুরানী, আফগানী বলে কিছু না থাকে।' কিংবা যখন আরো মানসিক স্বচ্ছতা নিয়ে বলেন—'মানবতার অর্থ মানুষকে সম্মানিত করা, তাই মানুষের সম্মান ও মর্যাদা সম্পর্কে সজাগ হও। হে মানুষ, তুমিও তাই তোমার অন্তরের প্রশস্তকোণে পৌত্তলিকতা ও ইসলামের জন্য ঠাঁই করে নাও। শত আক্ষেপ সেই অন্তরের জন্য যেখানে অন্য হৃদয়ের স্থান নেই বরং পরস্পর বিচ্ছিন্ন।' (জাভেদনামা)।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে একই দেশের একই জাতির দুই প্রান্তের দুই ভিন্ন-ভাষী কবি যুগলের মধ্যে কতই না ব্যবধান। ছাব্বিশ বছর বয়সের তারতম্য শুধু নয়—শিক্ষা-দীক্ষা, বিদেশ-যাত্রা, রুচিশীলতা, উত্তরাধিকার ঐতিহ্য নিয়েও পার্থক্য বড় প্রকট। তবু এই দুই কবির মধ্যে আত্মিকযোগ ও সাহিত্য-সাযুজ্য বড় নিখুঁত।

কবি নজরুল তাঁর সাহিত্য-খ্যাতির স্বর্ণযুগেই ইকবাল-সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত হয়ে ওঠেন। কবি আব্দুল কাদিরের লেখা থেকে জানা যায়, ১৯৩২ সালে কলকাতার ৩৯ নং সীতানাথ রোডের বাসায় থাকাকালে কবি নজরুল একদিন আব্দুল কাদির, আজিজুল হাকিম, আব্দুল মজিদ সাহিত্যরত্ন প্রমুখের সম্মুখে ইকবালের 'আসরারে খুদী', 'শেকোয়া', হাফেজ ও ওমর খৈয়ামের সমগ্র রুবাইয়াত অনুবাদের সংকল্প করেন। তারই ফলশ্রুতিতে আসরারে খুদী অনুদিত হয় আব্দুল মজিদ কর্তৃক এবং শেকোয়ার অনুবাদ করেন আশরাফ আলি সাহেব এবং নজরুলকেই তা উৎসর্গ করেন। এইভাবে নজরুলই প্রথম ইকবাল সাহিত্যকে বাংলার কাব্য-মালঞ্চে এনে রাখী বন্ধনের কাজ করেন। এ প্রসঙ্গে মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্ বলেন—

> কাজি নজরুল ইসলাম ইকবালের কোনো রচনা অনুবাদ করেননি বটে, তবে প্রাচ্যের এই মহাকবির কাব্যের সাথে যে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল সে কথা মুহম্মদ সুলতান অনুদিত ইকবালের শেকোয়া ও 'জওয়াবে শেকোয়া' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকা পাঠেই বোঝা যায়, তাতে নজরুল এই অনুবাদ মূলের সঙ্গে মিলিয়ে পড়েছেন বলে নিজেই উল্লেখ করেছেন। ইকবালের কবিতা : ফাররুখ আহমদ ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

এই দুই কবির সাহিত্যকৃতি সম্পর্কে সৈয়দ আলি আহসান বলেছেন—

> 'নজরুলের দীপ্তি' অসাধারণ কিন্তু সেই দীপ্তির দাহন আছে স্নিগ্ধতা নেই, ইকবালের কাব্যে জ্বালা আছে, কিন্তু ধর্মের স্থির সত্যের সঙ্গে তাঁর অভাব নেই। তাই তা মূলত প্রশান্ত এবং জীবনানুভূতিতে অতুলনীয়।'

এ ব্যাপারে লেখকের সঙ্গে আমরা একমত হতে পারি না। কেননা নজরুল শুধু 'রণ-তুর্য' নয় শ্যামের হাতের, অর্ফিয়াসের বাঁশরীও তাঁর হাতে ছিল। তিনি তো নিজেই হয়ে উঠেছিলেন অর্ফিয়াস। গুলবাগিচার বুলবুলি আমি রঙীন প্রেমের গাই গজল—একথা তো তিনিই বলেছেন। তাঁর হাজার হাজার গান শুধু তাতাবার এবং মাতাবার জন্য নয়, প্রাণ জুড়িয়ে দেবার জন্যও বটে। ধর্মীয় জীবনানুভূতি না থাকলে তো ভক্তিগীতি ও ইসলামী রস-তত্ত্বের, মারফতী-তত্ত্বের, রসুল-প্রেমের গান তিনি রচনা করতে পারতেন না। ইকবালের কবিতার ছত্র যেমন উর্দুভাষী আলেমসমাজ উদ্ধৃত করেন, তেমনি নজরুলের প্রাণমাতানো ইসলামী গান দিয়েই বাঙালি আলেমেরা মিলাদে মহফিল ও জলসার মজলিশ জমিয়ে থাকেন। সব ভাষা-ভাষীর মানুষ সানন্দে যে সুধাবারি পান করে থাকেন। অন্তরে প্রেম না থাকলে, স্নিগ্ধ সৌন্দর্যের ঐশ্বর্য না থাকলে 'মোর প্রিয়া হবে এসো রানী'র মতো প্রিয়ার জন্য এমন সুরের তাজমহল রচনা করেছেন কোন্ কবি? এখানে তিনি যেমন সম্রাট শাহজাহানের প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রতিস্পর্ধী তেমনি কুয়েশের মতো আল্লাহ্-প্রেমে বেহুঁশ-বিভোর। আল্লাহ্-প্রেমের শারাব পিয়ে বেহুঁশ হয়ে রই পড়ে।'

ইকবাল বলেছেন— 'আমি অনাগত যুগের কবি। আজকের যুগ অনুভব করে না আমার বাণীর অর্থ।' নজরুলও সমকালের কবি হিসেবে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে উঠলেও সমালোচিত হয়েছেন, তাঁকে ঠিকমতো অনুধাবন করতে না পারার কারণে। এইজন্য বলতে বাধ্য হয়েছেন— 'আজ কোনো আলোচনা হলেও, ভবিষ্যতে যখন আলোচনা হবে, ইতিহাস লেখা হবে, তখন আমার কথা সবাই স্মরণ করবেন— এ বিশ্বাস আমার আছে।'

শিল্পীমনের স্বপক্ষে ইকবাল যে বেদনায় রাঙা—ইকবাল কহে,

> জগৎ মাঝার বন্ধু আমার কেহ নাহি আর
> কেবা জানে আর মোদের গোপন-বেদনার সন্ধান।'

সেই অন্তর্বেদনার শরীক বিদ্রোহী কবিতা—

> 'আমায় নহে গো, ভালোবাসো শুধু ভালোবাসো মোর গান
> গানের পাখিরে কেবা মনে রাখে গান হলে অবসান।
> ভালোবাসো মোর গান।।

কিংবা

> এ নহে বিলাস বন্ধু ফুটেছি জলে কমল
> এ যে ব্যথা-রাঙা হৃদয় আঁখিজলে টলমল।।

কিংবা

> মুসাফির মোছরে আঁখিজল ফিরে চল আপনারে নিয়া

প্রভৃতি গানগুলিতে বিষাদ-করুণ বেহাগের সুর বেজে উঠেছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইকবাল বলেছেন— গুটিয়ে নিয়ে আমার বোঝা
ছাড়ব যখন এই দুনিয়া
বলবে সবাই জানবে না গো
কেবা ছিল এই যে মিঞা!

নজরুলও বলেন— যেদিন আমি থাকব নাকো থাকবে আমার গান
বলবে সবাই কে সে কবির কাঁদিয়ে ছিল প্রাণ!

জাতীয় জাগরণের কবি হিসেবে কী অদ্ভুত সাযুজ্য ও ভাবানুভূতি দু'জনের—

ইকবাল বলেন— আজানের প্রথা রয়ে গেছে হায় বেলাল সে আর নাই,
দর্শন শুধু পড়ে আছে শোকে গাজ্জালী আর নাই।

নজরুল বলেন— রীশ-ই বুলন্দ শেরোওয়ানী চেগো তসবী ও টুপি ছাড়া
পড়ে না কো কিছু মুসলিম গাছ ধরে যত দাও নাড়া।

দুর্ভাগ্যের অংশেও ভাগাভাগি দু'জনের। ইকবালের তরনায়ে হিন্দ। (ভারত-সংগীত) রবীন্দ্রনাথের জনগণমনে'র সাত বছর পূর্বের রচনা এবং সর্বভারতীয় রূপে জনপ্রিয় হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় সংগীতের মর্যাদা পায়নি। হিন্দুস্তাঁ শব্দটি থাকার জন্য পাকিস্তানেরও জাতীয় সংগীত হয়নি। কবি হিসেবে ইকবালের এই ক্ষতি অপূরণীয়। (সত্য গঙ্গোপাধ্যায়)।

অনুরূপ নজরুলের 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার', 'চল চল চল' ও অন্যান্য দেশাত্মবোধক গান নেতাজীর অত্যন্ত পছন্দনীয়, বহু গীত ও চর্চিত হলেও জাতীয় সংগীতরূপে গৃহীত হয়নি— না ভারতে, না বাংলায়, না পাকিস্তানে। কবি হিসেবে, সঙ্গীতকার হিসেবে নজরুলেরও এ ক্ষতি অবিস্মরণীয় অনুতাপের।

পরিশেষে সমালোচকের উক্তি দিয়ে এ প্রসঙ্গের উপসংহার টানতে চাই—

> "মুসলিম রেনেসাঁর হিসেবে ইকবাল নজরুল ইসলামের সঙ্গে তুলনীয়। ইকবাল উর্দু ও ফারসি সাহিত্যে যা করেছেন— নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যে তাই করে গেছেন। ইকবাল মুসলমানদেরকে নতুন নতুন সম্ভাবনার দ্বার উদ্‌ঘাটন করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। এদিক দিয়ে ইকবাল ও নজরুল একই ভূমিকায় সাহিত্য-জগতে কাজ করেছেন।
>
> উভয় কবিই ইসলামের দৃঢ়প্রীতি নিয়ে বুকে দুর্জয় সাহস নিয়ে এবং বলিষ্ঠ লেখনী ধারণ করে এগিয়ে এসেছিলেন, নতুন কর্ম প্রেরণায় জাতিকে জাগাতে। এই দুই কবির অবদান এদিক থেকে অবিস্মরণীয়। জাতি বহুকাল অবধি তাঁদের কাব্য থেকে চলার পথে অফুরন্ত প্রেরণা ও শক্তি লাভ করে ধন্য হবে।"
>
> (গোলাম রসুল : ইকবাল প্রতিভা)।

রুমী ইকবালের প্রিয় কেন

স্যার ইকবালের মতো বিপ্লবী চিন্তা-চেতনার কবি হয়েও রুমীকে গুরুর আসনে বসিয়েছেন কেন? দীর্ঘ ব্যবধান সত্ত্বেও এবং পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও রুমীর মধ্যে কী মাহাত্ম্য খুঁজে পেয়েছেন। যে কারণে বলেছেন— নবী নয় তবু তাঁর রয়েছে কেতাব। অথচ ফারসি সাহিত্যে তো আরো বড়ো বড়ো কবি জন্মগ্রহণ করেছেন। শাদী, জামী, হাফেজ, ওমর খৈয়াম, আমীর খসরু প্রমুখ। আসলে মহাকবি দেশ-কাল-সচেতন কবি বলেও অন্তরে ছিলেন মরমী, তাত্ত্বিক, মিস্টিক। এদিক থেকে কবি নজরুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর অনেকখানি মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ইকবালে মুগ্ধ ছিলেন নজরুল, রবীন্দ্রনাথও। তবু রুমীকে অনুসরণ না করে রবীন্দ্র-পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন কবি হাফিজের ভক্ত। ভক্ত ছিলেন নজরুলও। তাই হাফিজের দেওয়ান এবং ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াতের অনুবাদ করে অনুরাগের পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন।

আসলে ইকবালও ছিলেন আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন সুফী কবি।

তাই বলেছেন— ভালবাসার সাধ যদি থাকে তো ফকিরদের সেবা কর
প্রেমের মতো অমূল্য ধন বাদশাদের ধনাগারে পাবে না।

এখানে কবি নিজেকে 'ফকির' বলতে চেয়েছেন। নজরুলও নিজেকে ফকির বলতেন। অন্যত্র ইকবাল বলেছেন—

খোদা-পাগল দরবেশ না প্রাচ্যের না প্রতীচ্যের
আমাদের দেশ না ইস্পাহান, না দিল্লি না সমরকন্দ।

অর্থাৎ আল্লাহ্-প্রেমিকের স্থান সর্বত্র। তাঁরা সর্বগ। তাঁরা সকল কালের সকল দেশের সব মানুষের। এই পরিধি এই ব্যাপ্তি কবিত্ব শক্তির বিরাটত্বকেই প্রমাণ করে। আর তাঁদের মধ্যে না থাকে কোনো জাতি-বৈষম্য ইতরবিশেষ না থাকে ভেদাভেদ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাই বলেন— আল্লাহ্‌র বান্দা আল্লাহ্‌র পথ অনুসরণ করে
কাফের ও মুসলিম সকলের প্রতিই সে অনুরাগী হয়।

ইকবাল সেই সাহিত্য-শিল্প পছন্দ করতেন যা মানুষকে সুন্দর ও শক্তিশালী করে, যা মানুষকে ভালোবাসতে শেখায়। তিনি এও বলতেন—'কবিতার লক্ষ্য যদি হয় মানুষ গড়া তাহলে কবিরা পয়গম্বরদের উত্তরসূরী।' এই সৎ উদ্দেশ্য নিয়েই কবিতা রচনা করেছেন হজরত আলি (রা.), কবি হাসান নবিজির কাছে পুরস্কৃতও হয়েছেন ইসলামী কবিতা ও নবি প্রশস্তির জন্য। নজরুলের ইসলামী কবিতা ও গানের কোনো তুলনা নেই। উম্মাহাতুল মুমেনিন হজরত আয়েশা (রা.)-ও কবি ছিলেন। কবিতা লিখতেন মা ফাতেমা। মুসলিম সুফী সাধিকাও জন্মগ্রহণ করেছেন অনেক যাঁরা কবিতা লিখতেন। তাই আলেমরা যদি নবির উত্তরাধিকার (নায়েবে নবি) হন তাহলে সুফী কবিরাও অবশ্যই তা হতে পারেন। এটা ইকবালের অভিমত। আর এক শ্রেণির ভণ্ড ফের্কাবাজ সংকীর্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন অনুদার আলেমকে তিনি সহ্য করতে পারেননি। যারা ধর্মের নামে মানুষকে ঘৃণা করতে বিচ্ছিন্ন করতে বিবাদ করতে শিক্ষা দেয়। তাই বলেছেন—মোল্লার ধর্ম হল আল্লাহর নামে অশান্তি সৃষ্টি করা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'দীন-দান', 'দেবতা-বিদায়', নজরুল তাঁর 'মানুষ' কবিতায় একই কথা বলেছেন। বলেছেন—

'মোল্লা-পুরুত লাগায়েছে তার সকল দুয়ারে চাবি।'

এই জন্যই ইকবাল বলেছেন—কবিরা জাতির জীবনকে আবাদ করতে পারেন আবার বরবাদ করতেও পারেন।

তিনি এও বলেছেন—ওই কবিদের অবজ্ঞা করো না, কেননা ওদের কাব্যে কবিতা ছাড়াও মহত্তর উদ্দেশ্য আছে। কবিরা জাতি-গড়ার কারিগর। জাতির পথ-প্রদর্শক। তাই কবির উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে তিনি বলেন—কবিদের উচিত নতুন জাতির নতুন পথের দিশারী হয়ে কাজ করা। আর এই আদর্শ পুরোপুরিভাবে পেয়েছিলেন তিনি রুমীর মধ্যে। তাই রুমী তাঁর প্রিয় কবি। তাঁর জীবনের ধ্রুবতারা।

বলেন—

রুমীর প্রতিভা-দীপ্তি উদ্দীপিত করেছে আমারে...
পতঙ্গের মতো মোরে গ্রাস করিয়াছে তাঁর দীপ্ত অগ্নিশিখা।
স্বর্ণ-মহিমায় মোর মৃত্তিকারে ফিরায়েছে রুমী
দীওয়ানা মাতাল আমি মত্ত তাঁর সুরের নেশায়।

রুমী সম্পর্কে উইলসন বলেছেন— His book should be read not only by the students of theologe but by all students as a book of General Philosophy.

সাহিত্য রুমীর কাছে তাসাউফের পথকে মসৃণ করেছিল। শুধু নিছক সৌন্দর্য-চর্চা বা বিলাসের বস্তু হিসেবে তাকে না দেখে আল্লাহ্‌কে পাওয়ার উপায় হিসেবে অন্তরের ধর্ম বলে মনে করেছিলেন। এখানে তিনি শুধু মিস্টিক নন তিনি আল্লাহ্‌প্রেমিক সুফী দরবেশ। আল্লাহ্‌র সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক হবে আশেক-মাশুকের। ইপ্সিত পাবার জন্য পাগল পথিক হওয়া।

অন্তর সেখানে মনের অজান্তেই বলে উঠবে—

বেদনা-ভরা পুলকে আজ সঁপি তোমা হৃদয়খানি।

জালালুদ্দিন রুমী ১২০৭ খ্রিস্টাব্দে পারস্যের বলখ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। পরে পশ্চিম এশিয়ার রুম প্রদেশে বসবাস করেন। পাঁচ বৎসর বয়স থেকেই তিনি জ্যোতির্লোক লক্ষ করলেন। অর্থাৎ তিনি ছিলেন জন্ম-অলি। তাপস প্রবর। পিতা বাহাউদ্দিন তা দেখে তাঁকে 'মৌলানা' বলে অভিহিত করতেন।

ছয় বৎসর বয়স থেকে রোজা রাখতেন। সাত বৎসর বয়সে কোরানের সুরাগুলি ভক্তি ভরে পড়তে পড়তে তাঁর অশ্রু নির্গত হতো। অলৌকিক ঘটনা লক্ষ করা যেত তাঁর বাল্য জীবন থেকে। মাঝে মাঝে সাতদিন ব্যাপী রোজা রাখতেন।

তাপস ফরিদুদ্দিন আত্তার ছয় বৎসর বয়সে তাঁর মুখচ্ছবি দেখে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দোয়া দেন। সৈয়দ বোরহানউদ্দীনের নিকট তিনি শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। তিনি তাঁকে বাতেনী শিক্ষা দেন। সাত বৎসর ধরে তিনি দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। এখানে তিনি মহাতপা শাম্‌সে তাব্রিজের সংস্পর্শে আসেন এবং ওস্তাদ হিসেবে গ্রহণ করেন।

কুনিয়াতে থাকেন যখন তখন তিনি ধ্যানযোগে তাতারদের আক্রমণের বিষয় জানতে পারেন এবং দামেস্কবাসীর সহায়তা করেন। অলৌকিকভাবে দামেস্ক নগরী সেবার রক্ষা পেয়েছিল। সারারাত্রি তিনি নানা গ্রন্থ দণ্ডায়মান অবস্থায় পাঠ করে জ্ঞান-সঞ্চয় করতেন। কথিত আছে (১২৪০ খ্রি.-এ) জীর্ণবস্ত্র-ভগ্নপাত্রধারী এক ফকির রুমীকে জিজ্ঞাসা করেন—বলুন তো কে বড়—হজরত মুহাম্মদ (সা.) না বায়জিদ বোস্তানী? রুমী বললেন— নিশ্চয় হজরত মুহাম্মদ (সা.)। তখন ফকির শামসে তাব্রিজ বললেন—তাহলে একথার অর্থ কী? —হজরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন—হে খোদা, আমরা তোমাকে বুঝতে পারলাম না। আর বায়জিদ বলেছেন— কী বিরাট আমার মহিমা। আমি ধন্য। রুমী বুঝলেন এ ব্যক্তি অসাধারণ। উত্তর করলেন—বায়েজিদ মারেফাতের

pdf By Syed Mostafa Sakib

অতি উচ্চস্তরে পৌঁছে থেমে গেছেন এবং সেখানেই আত্ম-বিহ্বল অবস্থায় অন্তরের গূঢ় অনুভূতি প্রকাশ করে ফেলেছেন। কিন্তু রসুলুল্লাহ্ (সা.) একে একে সিদ্ধির সকলস্তর অতিক্রম করে গেছেন। এবং উচ্চতম স্তরে পৌঁছে কুণ্ঠা-বিনয় ও বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। পরিশেষে রুমী তাঁরই শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

শামসে তবরিজের দেওয়ান গভীর তত্ত্বকথায় পরিপূর্ণ কেতাব। রুমী তাঁকে নিয়ে যেন পাগল হয়ে যান। তাঁর অদর্শন সহ্য করতে পারতেন না। দামেস্কের সুলতান ওয়ালিদ পর্যন্ত তাঁর উটের রেকাব ধরে পদব্রজে যোগ দিতেন। হঠাৎ শামসে তব্‌রিজের অন্তর্ধান ঘটে। তার রহস্যের কোনো কিনারা পাওয়া যায় না। তাঁর বিরহেই জন্ম নিল রুমীর কবিতা। মসনবী ও দেওয়ানে তবরিজ।

তিনি অত্যন্ত নম্র এবং বিনয়ী ছিলেন। কথায় কথায় নবিজির কথা তুলে ধরতেন শিষ্যদের সামনে।

কুনিয়ার শাসনকর্তা মঈনুদ্দিন এক ভোজসভার আয়োজন করেন। সেখানে গণ্যমান্য সবাই উপবিষ্ট। বসবার জায়গা নেই। রুমী গিয়ে বসলেন সভার মধ্যস্থলে জমিনে। যেখানে উপবিষ্ট ছিলেন তাঁর মুর্শিদ শাম্‌সে তবরিজ।

একদা এক পুত্রহারা পিতা রুমীর কাছে এসে শোকাতুর হয়ে কাঁদতে থাকেন। কাঁদলেন রুমীও। তাঁর কান্না—হায় একটি পুত্রের জন্য লোক এত কাঁদে অথচ জীবন-সর্বস্ব, সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ খোদাকে হারাতে বসেছে বলে যদি কাঁদত তা হলে না জানি জগতে কত প্রলয়কাণ্ডই না ঘটে যেত।

তিনি মনে করতেন কাবা হচ্ছে মানুষের অন্তর। মনে করতেন শুধু পাপকার্য করলেই পাপ হয় না। পাপ চিন্তা করলেও পাপ অনুষ্ঠিত হয়।

শাসনকর্তা পরওয়ানা একদিন জিজ্ঞাসা করেন জালালুদ্দিন তাঁকে হেদায়েত করেন না! জালালুদ্দিন বলেন— আপনি কি কুরআন এবং জামিউল ওসুল (নীতিশাস্ত্র) পাঠ করেননি? বললেন— হ্যাঁ পড়েছি।

রুমী বলেন— কুরআন আর জামিউল ওসুল যা পারেনি তাকে আমি কী করে সংশোধন করতে পারি?

১২৭৩ খ্রিস্টাব্দে রুমী দেহত্যাগ করেন। অসুখের সময় হেকিম সদরউদ্দিন চিকিৎসা করতে গিয়ে অশ্রুসজল হয়ে ওঠেন। রুমী বলেন—

তোমরা কী করে জানবে কোন্ রাজঅতিথি সংগোপনে আমার পাশে বসে অপেক্ষা করছেন। আমার মুখের সলজ্জ স্বর্ণ আভার দিকে তাকাবে না, কেননা আমার পায়ে লৌহবন্ধ বিদ্যমান অর্থাৎ আমি রুদ্ধচরণ আমার প্রিয়তমের কাছে।'

তিনি বলতেন— মানুষের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ যাঁর দ্বারা জগতের কল্যাণ সাধিত

হয়। আর বাক্যের ভিতর তাই শ্রেষ্ঠ যা সংক্ষিপ্ত অথচ সমুচিত। তিনি তদ্গত চিত্তে কখনো বা বলেছেন— গত নিশায় আমি আমার প্রভুর মরণদূতের বংশীধ্বনি শুনেছি। মৃত্যু-দর্শন সম্পর্কে মসনবীতে বলেছেন— তাঁর আত্মা নলবনের একটি বংশী। সে স্বস্থানচ্যুত হয়ে মর্তধামে নিশিদিন কেঁদে ফিরছে ও আপনার শোকোচ্ছ্বাস গেয়ে বেড়াচ্ছে। স্বগোত্র স্বজন হতে যে বিচ্ছিন্ন হয়েছে সে যতই চায় তার স্বস্থানে ফিরে যেতে। কবে সে স্বস্থানে তার স্বজনের (প্রভুর) নিকট ফিরে যাবে।

তাঁর মৃত্যুতে তুর্কী, রোমান, ইহুদি, খ্রিস্টান সবাই যোগ দিয়েছিল।

শেখ সদরুদ্দিন তাঁর জানাজার নামাজ পড়াতে গিয়ে চীৎকার করে পড়ে গেলেন। কাজি সেরাজুদ্দিন সে কাজ সমাধান করেন।

শোনা যায় শিরাজের সুলতান শামসউদ্দিন হিন্দ চেঙ্গিজ খাঁর উদ্দেশে মৌলানা শেখ সাদীকে একটি কবিতা লিখতে বললে— শেখ সাদী তরুণ কবি রুমীর কবিতা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কবিতাটির ভাবার্থ—

বেহেশতের খোশবাগে আজ নওরোজের মহোৎসব। বিশ্বের সকল মানুষের সেখানে নিমন্ত্রণ, শুধু খাস বান্দাদেরই নয়। কে পাপী আর কে পুণ্যবান সে প্রশ্ন আজ নেই। বিশ্বের কারা আজ প্রহরীহীন। আর বেহেশতের দ্বার অবারিত। দুনিয়ার মানুষ তাই ছুটে চলেছে অনন্ত মিছিলে সেই মুক্তির ডাকে। সে অপূর্ব মিছিলের দর্শক বলে কেউ রইল না এই দুনিয়ায়। কেননা সবাই তার যাত্রী।' (এটি আল্লাহ্‌কে উদ্দেশ্য রচিত।)

রুমীর গজলে এমনই একটা মাদকতা আছে যার জোশ ও মাদকতায় শ্রোতারা রাত্রির পর রাত্রি বিনিদ্র কাটিয়ে দিত। এই সমস্ত গজল অনেক সময় বাদ্যযন্ত্রের সহযোগে গীত হতো। তন্মধ্যে রবাব ছিল অন্যতম।

ভাবের গভীরতা রসের মাদকতা ও উপদেশের সারবত্তার জন্য পারস্যবাসীগণ মসনবীকে কুরআনের নিম্নেই স্থান দিয়ে থাকেন। আসলে মসনবী তো কোরআনেরই নির্যাস থেকে রচিত।

একসময় মহাকবি জামী তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন—

মসনবীরা মা'নবি ইয়া মা'শন্‌বী— অর্থাৎ মসনবীকে পড়বে না শুনবে না। কিন্তু তিনিই একদিন মসনবী পাঠ করে মুগ্ধ চিত্তে বলে ওঠেন—

মসনবীয়ে হাস্ত কুরআন দর যবানে পাহ্‌লবী
মসনবী মৌলবীয়ে মা'নবী।

অর্থাৎ মসনবী পারস্য ভাষায় কুরআন স্বরূপ। এ তো আমাদের যথার্থ পথপ্রদর্শক।

pdf By Syed Mostafa Sakib

রুমীর অগ্রদূত হচ্ছেন তাপস কবি আত্তার ও সানায়ী। তাঁদের ললিত ছন্দ ও গভীর তত্ত্বকথা তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। তিনি বলেন—

আত্তার রুহবদ ও সানায়ী দো চশমেউ
মা আয পায়ে সানায়ী ও আত্তার আমাদেম।

অর্থাৎ আত্তার মরমী শিক্ষার প্রাণ ও সানায়ী তার দুটি চক্ষু। আমি তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছি মাত্র।

সুফী সাধকদের মতে দেহই মানবাত্মা ও পরমাত্মার মহা অন্তরায়। দেহের অবসানেই আত্মার মুক্তি। তাই সুফীরা দেহ-কারা হতে মুক্ত হয়ে প্রিতমের মিলনাকাঙ্ক্ষায় সদা ব্যস্ত, সদা লালায়িত। আর সে প্রিয়তমকে লাভ করতে হলে নফস বা প্রবৃত্তি দমন, কৃচ্ছ্র সাধন, লোভ-মোহ-মাৎসর্য কাম-ক্রোধকে দমন এবং প্রভুকে পাওয়ার জন্য শুধু রোদন বা অশ্রু বিসর্জনই যথেষ্ট নয় বরং প্রাণ পর্যন্ত সঁপে দিতে হয়। পতঙ্গ যেমন সঁপে দেয় নিজেকে অগ্নি-শিখায়।

এইজন্য সাধনার বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করতে হয়। অর্থাৎ ইসলামে মুসলমানদের জন্য যেসকল অবশ্য পালনীয় ধর্মীয় বিধি আছে তা হচ্ছে শরীয়ত। পক্ষান্তরে আধ্যাত্মিক সাধনার সামগ্রিক নাম মারেফাৎ। এর তিনটি স্তর যথা—তরিকত, হকিকত ও মারফাৎ। মারফাতের পথিককেই সুফী বলা হয়। এরই স্তর আছে—ফানাফিল্লা, বাকাবিল্লাহ্ প্রভৃতি। সুফীরা সাধনার একস্তরে অলৌকিক জ্যোতি দেখে থাকেন— একে হাল বলা হয়। রুমী বলেন— ধন্য সেই মহাজন যিনি প্রেম ও হাল অর্থাৎ পরমাত্মার সঙ্গে মিলন সুখের অভিলাষে গৃহ ধন মাল ও রাজ্য-সুখ বিসর্জন দিতে পারেন। প্রেমাস্পদই জীবন। তাঁকে ছাড়া জীবন মৃত। হালের গভীর ও নিবিড়তম অবস্থার নাম মকাম। এই অবস্থায় আত্মা ও পরমাত্মার ভিতর লীলাভিনয় ও গোপন বিহার চলতে থাকে। 'মধুকর যবে মধু করে পান রহে না চঞ্চলতা'—এইরূপ অবস্থা হয়। নদীর সাগরে মিলিত হওয়ার ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু অনেক সময় চিত্ত-চাঞ্চল্যের জন্য 'আনাল হক' বা 'আমি খোদ'-র মতো ভ্রান্তি উপলব্ধিও হয়। যেমন হয়েছিল মনসুর হাল্লাজের। এরও উপরে উঠতে হবে।

সাধক ও সুফী কবি রুমী তাই অনুভব করেছেন— আহা! আমার প্রিয়তমের অধরের সঙ্গে যদি আমার ওষ্ঠ সংযোজিত হতো, বাঁশির মতো আমি তোমার সকল মর্ম কথা গেয়ে যেতে পারতাম।

মসনবী এই পরমার্থ প্রেমেরই অফুরন্ত ভাণ্ডার। রুমীর মতে প্রেমই সকল আধিব্যাধির মহৌষধ। যা মনকে সকল মলিনতা, সব পাপাচার হতে মুক্ত পবিত্র ও

উন্নত করে। কবি তাই বলেছেন— প্রেমের বলেই মাটির দেহ (আমাদের নবি) আকাশে উন্নীত হয়েছেন। প্রেমের স্পর্শে পর্বত নৃত্যপর ও সচল হয়েছিল। প্রেমই তুর পর্বতের জীবন সঞ্চার করেছিল ও উন্মাদনা এনে দিয়েছিল। তুর তখন মাস্ত্ হয় আর মুসা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে যান।

রুমী তাই বলেছেন— যখন তাঁকে (আল্লাহ্কে) ভুলে থাকি তখনও তাঁর অন্ধকারায় বন্দি থাকি, আর যখন তাঁর সম্বন্ধে সচেতন হই, তখনও তাঁর অঙ্গানে বিরাজ করি। এভাবেই আমরা পরস্পর অবিচ্ছিন্ন। এই প্রেমসত্তার মহাজাগতিক সূর্যালোকের সন্ধান রুমীর মধ্যে পেয়েছিলেন বলেই ইকবাল রুমীর দীওয়ানা না হয়ে পারেননি।

ঋণ স্বীকার

১। ইকবালের কবিতা—সত্য গঙ্গোপাধ্যায়।
২। ইকবাল প্রতিভা—অধ্যাপক গোলাম রসুল।
৩। বিশ্ব-মরমী চিন্তা-ধারায় রুমী—অধ্যাপক গোলাম রুসল।
৪। মুসলিম মণীষা—আব্দুল মওদুদ।
৫। পারস্য প্রতিভা—মুহাম্মদ বরকতুল্লাহ্।
৬। কাজি নজরুল ইসলাম ও বাংলা সাহিত্য—শেখ আজিবুল হক।
৭। নজরুল রচনাসম্ভার (১ম খণ্ড)—আব্দুল কাদির।
৮। মুসলিম জাহান পত্রিকা (৯ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা)।
৯। অন্যান্য।